লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ১৮তম সংখ্যা

১৭ চৈত্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ■ ২২ রবিঃ আউঃ, ১৪২৯ হিজরি
৩১ আমান, ১৩৮৭ হিঃ শাঃ ■ ৩১ মার্চ, ২০০৮ ঈসাব্দ

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

এক নজরে জামালপুর জোনের ১ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ২০০৮, ছোনটিয়া জামাত

লাজনা ইমাইল্লাহ'র বোনদের জন্য
টিভিতে জলসা প্রদর্শনের ব্যবস্থা

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৪
- হাদীস শরীফ ৫
- অমৃতবাণী ৬
- জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্ তাআলার সকল নেয়ামতের ন্যায় প্রতিপালন বৈশিষ্ট দ্বারাও সবচেয়ে বেশী কল্যানমন্ডিত হয়েছেন আঁ হযরত (সা.) ৭-১৬
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)
- ইকামাতিস্ সালাত ঃ ১৭-২১
  মূল ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ
  ইমাম মসজিদ ফজল লন্ডন
  অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- খাতামান্নাবীঈন মহানবী (সা.)-এর প্রেমে এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) ২২-২৪
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বয়আত দিবস ২৩ মার্চ ২৫-২৮
  মৌলবী এনামুল হক রনী
- ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ২৯-৩১
  আমীর মাহমুদ ভূইয়া
- স্বর্গ সুখ বনাম নরক যন্ত্রণা ৩২-৩৫
  মাকসুদা রহমান
- সংবাদ ৩৬-৩৭

প্রচ্ছদ : ১ম আঞ্চলিক সালানা জলসা-০৮ জামালপুর জোন

মার্চ মাস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মাস। মার্চ মাস আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার মাস। মার্চ মাস আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রতিষ্ঠাবার্ষীকীর মাস এবং গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান মাস।

আজ থেকে ১১৯ বছর পূর্বে ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মহান খোদা তাআলার ঐশী বাণী মোতাবেক ভারতের লুধিয়ানা শহরে মরহুম হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব-এর বাড়ীতে বয়আত নেয়া শুরু করেন আর এতে ৪০ জন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি তাঁর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের অগ্রযাত্রা।

যাঁরা আল্লাহ্র প্রিয় ব্যক্তি হন তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করতে চান না। তাঁরা মনে করেন–আমি তো অতি সাধারণ এক ব্যক্তি, আমার দ্বারা তো নবীর কাজ হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ্ ভাল জানেন কার দ্বারা কোন্ কাজ সম্ভব। আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, শেষ যুগের মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য যাঁর দরকার তিনি হলেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকেই মনোনীত করেন আর তিনি মহান খোদার আদেশে জগদ্বাসীকে জানালেন, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যাঁর অপেক্ষায় তোমরা রয়েছো। যেই তিনি এই ঘোষণা দিলেন আর সাথে সাথে বিরোধীতার ঝড় উঠলো।

আমরা জানি, বিরোধিতা নবী রসূলদের সত্যতার বড় প্রমাণ। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সকল নবী রসূলদের প্রতি তাঁর জাতির পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা হয়েছে তবু আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা তাঁদেরই জয়ী করেছেন। তেমনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিরুদ্ধেও চরম বিরোধিতা হয়েছে, কিন্তু খোদা যাঁকে দাঁড় করান তাকে কি কেউ রুখতে পারে? বিরোধিতার ঝড় চারদিকে বইছে আর তিনি ঘোষণা দিলেন আমি জানি খোদা তাআলা আমার সঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হয়ে যাই এবং পদদলিত হয়ে যাই আর এক অণূর চেয়েও ক্ষুদ্রতর হয়ে যাই তবু আমিই জয়ী হবো। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ব্যতীত আমাকে কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধরা! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনও অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, তিনি আমাকে বিনাশ করবেন? নিশ্চই স্মরণ রাখবে এবং কান পেতে শুনে নাও, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় আর আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার রেশমাত্র নেই। (আনোয়ারুল ইসলাম পুস্তক)

আজ জগদ্বাসী চিন্তা করে দেখুক, যারা সেদিন আহমদীয়া জামাআতের বিরোধিতা করেছিলো তারা আজ কোথায় আর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত কোথায়? সে দিনের হিসাব ছিলো ৪০ জনের আর আজ ২০ কোটিতে হিসাব হচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে সে সংখ্যা বেড়েই চলছে। সে দিন এক গ্রাম থেকে সত্যের ধ্বনি উঠেছিলো আর আজ ১৯০ টি দেশে হাজার হাজার গ্রাম থেকে সেই ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে। পৃথিবীতে আজ দ্রুত গতিতে আহমদীয়াত যে প্রসার লাভ করছে তা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতারই প্রমাণ। আজ **Muslim Television Ahmadiyya** সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের শ্বাশ্বত বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।

পরাধীনতার গ্লানিময় কালিমা ঘুচায় স্বাধীনতা আর সমাগত পরম সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিলে দূরীভূত হয় অন্তরের কালিমা। পুত-পবিত্র আলোকচ্ছটায় অন্তরাত্মা আলোকিত হয়ে ওঠে। মহান খোদা তাআলা সকলকে মার্চ মাসের এই উভয় উপলব্ধিবোধে শানিত হয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে মুক্তি লাভের তৌফিক দান করুন, আমীন।

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১০২। তুমি বল, 'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা (ঘটে চলেছে) [১২৯১] তোমরা তা লক্ষ্য করে দেখ'। কিন্তু যারা ঈমান আনে না (এ) নিদর্শনাবলী ও সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

১০৩। অতএব তারা কেবল তাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের দিন কালের অনুরূপ (দিনকাল) দেখারই অপেক্ষা করছে। তুমি বল, 'তবে তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৪। এরপর এভাবেই (আযাবের সময়) আমাদের রসূলদের ও যারা ঈমান এনেছে আমরা তাদের উদ্ধার করে থাকি। মু'মিনদের উদ্ধার করা আমাদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۠ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৫। তুমি বল, হে মানব জাতি! আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাকলে (জেনে রাখ) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর আমি তাদের উপাসনা করি না এবং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন আর আমাকে মু'মিনদের একজন হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১০৬। এও (আদেশ দেওয়া হয়েছে), তুমি সব সময় (আল্লাহ্‌র প্রতি) সদা বিনত থেকে তোমার মনোযোগ ধর্মে নিবদ্ধ কর এবং তুমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১২৯১। 'আকশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা আছে তোমরা তা লক্ষ্য করে দেখ!'–এই উক্তির মর্মার্থ ঃ যে সকল উপাদান বা উপকরণ রসূল (সা.)-এর মিশনকে কৃতকার্যতায় উন্নতিতে পৌঁছে দেয়ার অবধারিত সেগুলো পূর্বাহ্নেই আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, ধর্ম নিজ সুন্দর শিক্ষা বলে উন্নতি করতে সক্ষম, এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা বা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

হাদীস শরীফ

মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করা নিষেধ

কুরআন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো, কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে হাসি-বিদ্রূপ না করে তারা ওদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে আর নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে হাসি বিদ্রূপ না করে, তারা ওদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না ও একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পরে দোষণীয় নাম (দিয়ে ডাকা) বড়ই মন্দ কথা এবং যারা এরপর তওবা করবে না তারাই যালেম" (সূরাতুল হুজুরাত ঃ ১২)।

হাদীস ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললো, মানুষ তার জামা-কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পসন্দ করে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। অহংকার হলো সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম এ জগতের মানুষকে সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এমন সমাজ গঠন করতে চেয়েছে যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো সুরাতুল হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াত। যেখানে আল্লাহ্ তাআলা ঠাট্টা-বিদ্রূপ, একে অপরের প্রতি কটুক্তি ও খারাপ ডাকনামে ডাকতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা এমন কর্মকে দুষ্কর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

আমরা যদি চিন্তা করি, মানুষ কেন এমন কর্ম করে, উত্তর পাওয়া যাবে যে, সে নিজেকে বড় ও ভালো মনে করে। আর এ কারণে সে অপরকে অবজ্ঞা করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মানুষের অবজ্ঞা করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয় অহংকার হতে। আর অহংকার এমন পাপ যা অহংকারীকে জান্নাত হতে বঞ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবাটাই এমন এক কাজ যা তাকে ধীরে ধীরে অমানুষে পরিণত করে। এবং এর ফলে আরো বড় বড় পাপ তার মাঝে সৃষ্টি হয়। পরিণামে সে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা সোজা, সরল পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হয়ে যাও। যদি তোমাদের মাঝে অহংকারের কণা মাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে দূর করে দিবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোথাও অহংকার কপটতা আত্ম-শ্লাঘা বা আলস্য থাকে তাহলে তোমরা কখনোই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না"। তিনি (আ.) আরো বলেন, "বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে তাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হয়ে আত্মভিমানে দরিদ্রের সম্মুখে গর্ব না করে তার সেবা করবে।"

আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আলহাজ্জ মাওলানা
সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বয়আতের তাৎপর্য

"জেনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র মৌখিক বয়আতের (অঙ্গীকারের) কোনই মূল্য নেই, যে পর্যন্ত দৃঢ় চিত্ততার সাথে এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা না হয়" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২০)

"বয়আতের অর্থ বিক্রয় করে দেয়া, যেভাবে কোন দ্রব্য বিক্রয় করে দেয়ার পর এর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এটা ক্রেতার অধিকার। সে যা চাইবে তা-ই করবে। এভাবেই যার নিকট তুমি বয়আত করছ যদি তার আদেশের ওপর ঠিক ঠিক না চল তবে কোন উপকার লাভ করবে না" (মলফূযাত খন্ড, ৫ পৃঃ ২৮১)।

"বয়আতের তাৎপর্য সম্পর্কে পুর্ণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং এর অনুগমন করা উচিত। বয়আতের তাৎপর্য এই যে, বয়আত গ্রহণকারী তার মাঝে সত্যিকারের পরিবর্তন এবং নিজ হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে নিজের জীবনকে একটি পবিত্র উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করে দেখাবে। যতি এরূপ না হয় তবে বয়আতে কোন লাভ নেই; বরং এ বয়আত তার জন্য আরো আযাবের কারণ হবে। কেননা, অঙ্গীকার করার পর জেনে বুঝে ও সজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক" (মলফূযাত, ১০ খন্ড, পৃঃ ৩৩)।

"তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সকল প্রকার পাপ হতে বাঁচতে থাক। এতদ্ব্যতীত এ অঙ্গীকারে মজবুত থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাক। তিনি নিশ্চিতরূপে তোমাদেরকে আশ্বস্তি ও শান্তি দিবেন এবং তোমাদের পদদ্বয়কে দৃঢ় রাখবেন। কেননা, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তকরণে খোদা তাআলার নিকট চায়-তাকে দেয়া হয়। আমি জানি তোমাদের মাঝে কেউ এমনও আছে, যাদেরকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আমি কি করব। এ পরীক্ষা নতুন নয়। যখন খোদা তাআলা কাউকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং কেউ তাঁর দিকে চলে তখন পরীক্ষার মাঝে দিয়ে যাওয়া তার জন্য জরুরী হয়। পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক অস্থায়ী ও নশ্বর। কিন্তু খোদা তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক সর্বকালের, কাজেই তাঁর দিক হতে মানুষ কেন মুখ ফিরাবে?" (মলফূযাত, ৭ খন্ড, পৃঃ ২৩৬)।

"যেভাবে পূর্বের মু'মিনদের পরীক্ষা হয়েছে, তদ্রূপেই এটা নিশ্চিত যে, বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-বিপদের দ্বারা তোমাদেরও পরীক্ষা হবে। অতএব সাবধান হও যেন এরূপ না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। যদি আকাশের সাথে তোমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তোমরা কখনো নিজেদের ক্ষতি সাধন কর তবে তা নিজেদের হাতেই করবে, দুশমনের হাতে নয়। যদি তোমাদের সকল জাগতিক সম্মান চলে যেতে থাকে, তবে খোদা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করবেন। অতএব তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। এটা নিশ্চিত যে, তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে এবং তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। অতএব এমতাবস্থায় তোমরা মনক্ষুণ্ন হয়ো না। কেননা তোমাদের খোদা তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়পদ আছ কি না। যদি তোমরা চাও আকাশের ফিরিশ্তারাও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা মার খেয়ে খুশি থাক। গালি খেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ব্যর্থতা দেখে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা খোদার শেষ জামাআত। অতএব, ঐ পুণ্যকর্ম করে দেখাও, যা স্বীয় উৎকর্ষতায় চূড়ান্ত পর্যায়ের হবে। তোমাদের মাঝে যে কেউ অলস হয়ে যাবে তাকে এক অপবিত্র বস্তুর ন্যায় জামাআত হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে এবং সে আক্ষেপের সাথে মরবে। সে খোদার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না" (কিশতিয়ে নূহ্ পৃঃ ৩১-৩২)।

আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি, যুগ এবং কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমিত নয় বরং তিনি সকল জাতির প্রভু সকল স্থানের প্রতিপালক সকল দেশের তিনিই রব্ব। সকল সৃষ্টি তাঁর হাতেই লালিত-পালিত হয় আর তিনিই সর্ব নির্ভরস্থল।

আল্লাহ্‌তা'লার সকল নেয়ামতের ন্যায় প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য দ্বারাও সবচেয়ে বেশি কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন আঁ-হযরত (সা.)।

হযরত আকদাস নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র জীবনের একান্ত ঈমান উদ্দিপক ঘটনাবলীর উল্লেখ যাতে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট বিশেষভাবে জগমগ করতে দেখা যায়।

এ যুগে তিনি (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্ত্বাতেও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হুযূর (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রাণ সঞ্জীবনী বিবরণ।

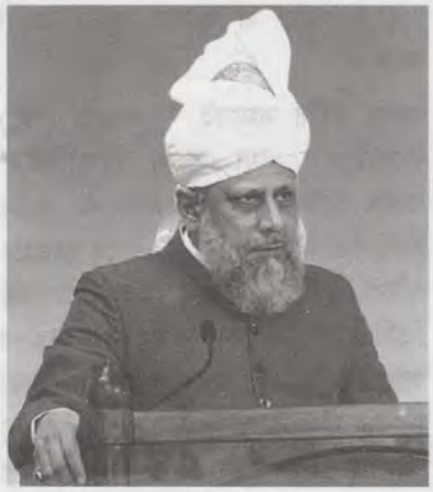

সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৬ (৮ই ফাতাহ্ ১৩৮৫ হিজরী শামসি) এর জুমআর খুতবা।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর্ রহ্‌মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন ইহদিনাস্‌সিরা তাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

আল্লাহ্‌তা'লা যিনি 'রব্বুল আলামীন' তাঁর প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন; যদ্দারা সব মানুষ, পশু-পাখি বরং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তথা প্রতিটি অন-পরমানু কল্যাণ মন্ডিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:-

"রব্বুল আলামীন' কত-ভাবগর্ভ একটি শব্দ! যদি প্রমাণিত হয় যে, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রেও, জনবসতি রয়েছে তাহলে সেই বসতিও এই শব্দের আওতায় পড়বে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্- রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠার পাদটিকা)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **"এ কথা বলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন যে, তিনি 'রব্বুল আলামীন' অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বসতি রয়েছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা দেহ হোক বা আত্মা, খোদাতা'লাই সবার স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।" অর্থাৎ তা জড়দেহ হোক বা আত্মা হোক খোদাতা'লাই এর সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। "যিনি সর্বদা তাদের প্রতিপালন করছেন আর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করছেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে সমগ্র জগতে প্রতিটি মূহুর্ত তাঁর 'রবুবিয়্যত' (প্রতিপালন), 'রহমানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমীয়্যত' (অনুগ্রহ) এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারের ধারা চলমান আছে।"**

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্-রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠার পাদটিকা)

এটি আল্লাহ্‌তা'লার একটি সার্বজনিন কল্যাণ যা প্রত্যেক বস্তুই লাভ করছে অথবা এথেকে সব কিছু অংশ পাচ্ছে বা

সবাই এদ্দারা কল্যাণ লাভ করছে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিপালনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার ঐ সকল লোকদের সাথে করেন যারা খোদাতা'লার বিশেষ বান্দা এবং এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছেন নবীগন (আ.) আর নবীদের মধ্যে সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

আজ আমি আল্লাহ্‌তা'লার এই বিশেষ বান্দাদের কিছু ঘটনার উল্লেখ করবো যারা আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ব্যবহারের ভাগী হয়েছেন। আমি বলেছি আল্লাহ্‌তা'লার সকল নেয়ামতের ন্যায় 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য থেকেও সবচেয়ে বেশি আশীস লাভকারী হচ্ছেন আঁ-হযরত (সা.)।

আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করবো যা থেকে জানা যায় যে, কিভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিভিন্ন ইচ্ছা এবং প্রয়োজন পূর্ণ করতেন, আর কেবল সরাসরি তিনিই (সা.) নন বরং তাঁর কল্যাণে তাঁর সাহাবীগণও সে সকল নেয়ামত থেকে অংশ লাভ করতেন যা 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের অধীনে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে প্রদান করতেন। আমরা সবাই জানি যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্ত্বা জন্মের সময় থেকে বরং তারও পূর্ব থেকে আল্লাহ্‌তা'লার রবু-বিয়্যতের এক উজ্জল নিদর্শন। তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভুর বিকাশের মহিমায় ভাস্বর যার বিবরণকে কোন ভাষায় আয়ত্ব করা সম্ভব নয় আর যার বর্ণনা কখনো শেষ হবে না। এতে আধ্যাত্মিক নিদর্শনের দীপ্তিও রয়েছে যদ্দারা খোদাতা'লার রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় আর বাহ্যিক-জাগতিক নিদর্শনাবলীও আছে; যা থেকে জানা যায় যে, কিভাবে খোদাতা'লা তাঁর প্রিয়'র সাথে নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন।

সর্ব প্রথম আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাক্যে 'রবুবিয়্যত' এর এক মহান আধ্যাত্মিক দ্যুতির বর্ণনা করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "রব্বুল আলামীন এর বৈশিষ্ট্য কিভাবে আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর কাজ করেছে দেখুন। তিনি একান্ত দূর্বল অবস্থায় লালিত পালিত হয়েছেন। মাদ্রাসা-মক্তবে যাবার কোন সুযোগ হয়নি যেখানে তিনি আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বৃত্তিকে শক্তিশালী করতে পারতেন। কখনই কোন শিক্ষিত জাতির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। ছোট-খাট কোন শিক্ষারও সুযোগ হয়নি, দর্শনের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের কোন অবকাশও পাননি। তারপর দেখো! এধরণের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও কুরআন শরীফের ন্যায় নেয়ামত তাঁকে (সা.) দেয়া হয়েছে যার সুমহান ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার সামনে অন্য কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব অর্থহীন। কোন মানুষ যদি কিছুটা বুঝে এবং মনযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে যে, বিশ্বের সকল দর্শন ও জ্ঞান, এর সামনে তুচ্ছ এবং সকল বিজ্ঞ ও দার্শনিক এথেকে অনেক পিছিয়ে আছে।"

(আল্ হাকাম ১৭ই এপ্রিল, ১৯০০ সন পৃষ্ঠা:৩, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বরাতে ১ম খন্ড ১৭১ পৃষ্ঠা)

অতএব দেখুন! যেভাবে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন জীবন্ত গ্রন্থ ছিল, সেই সময়ও সে অবস্থানুযায়ী তাদের জন্য নসীহত ছিল, তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করছিল। আজকে এযুগে যখন মানুষের সম্মুখে নিত্য নতুন বিষয়াদী ও আবিষ্কারাদী রয়েছে, এ সম্পর্কেও এই গ্রন্থ সংবাদ দিচ্ছে আর এ সকল নিদর্শন যে ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন কোন জাগতিক জ্ঞান ও দার্শনীক এর কাজ নয় বরং সেই 'রব্বুল আলামীন' এর কাজ যিনি প্রথম দিন থেকেই তাঁকে (সা.) নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার উঠাবসা, তাঁর স্বভাব, তাঁর প্রশিক্ষণের স্বতন্ত্রতা সে যুগেও সবার চোখে পড়তো। এসব প্রশিক্ষণ কোন একাডেমি কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ও কোন ব্যক্তির দয়া-মায়ার উপর নির্ভরশীল ছিলনা বরং এ তরবীয়ত সরাসরি সেই 'রব্বুল আলামীন' এর কাজ। তাই পবিত্র কুরআন তাঁর এ সকল জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত থাকা বরং পড়তে পর্যন্ত না জানার সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রথম ওহীর সময়েই আঁ-হযরত (সা.) বলেছিলেন, **'মা আনা বিক্বারিইন'** অর্থাৎ আমিতো পড়তে জানি না, তখন ফিরিশতা তিনবার নিজের সাথে সজোরে তাঁকে আলিঙ্গন করেন কিন্তু প্রতিবারই তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। তারপর আল্লাহ্‌তা'লা ওহী অবতীর্ণ করেন **'ইক্বরা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা'** (সূরাতুল্ আলাক্ব:০২) 'তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন'। এরপরে দেখুন সেই প্রভু! যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মাধ্যমে জ্ঞান ও মা'রেফাতের সেই ভান্ডার আমাদেরকে প্রদান করেছেন যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। আপত্তিকারীরা! যাদের মধ্যে বর্তমান পোপও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন, বলেন যে, কুরআন নতুন কি দিয়েছে? সেই প্রথম ওহীতেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর (সা.) মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, প্রভু-প্রতিপালকের বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্মেই

রয়েছে কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই এতে বিকৃতি সৃষ্টি করেছে আর সেই প্রভুর ধারণা বিকৃত করার পর ছোট-ছোট প্রভু বানিয়ে বসেছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমার এই বান্দার মাধ্যমে প্রভুর সাথে পরিচিত হও যার প্রতিটি কথার সূচনাই নিজ প্রভুর নামের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যে সম্পূর্ণভাবে আমার লালন-পালনের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে এবং তাঁর জ্ঞান ও মা'রেফতের পরাকাষ্ঠার উৎসও আমিই। কিন্তু যারা অন্যায় করার জন্য বদ্ধপরিকর, অজ্ঞতা বিদ্বেষ ও শত্রুতা যাদের রীতি তারা আদৌ দেখতে পায় না যে, নতুন কি দেয়া হয়েছে। কুরআন পূর্বেই এ ঘোষণা করেছে যে, এই শিক্ষা তারা বুঝবে না। এরূপ শত্রুতার ফলে এবং না বোঝার কারণে এমন মানুষ পবিত্র কুরআনের নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহ থেকে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বেশী। সুতরাং এটি তাদের নিয়তি। যাই হোক প্রতিপালনের এ মহান উক্তির উল্লেখের পর আঁ-হযরত (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালনের যে সকল দৃশ্য আমরা দেখতে পাই, আমি তার উল্লেখ করছি। যেভাবে আমি বলছিলাম যে, কথাতো কখনই শেষ হবে না তথাপি কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একটি সফরের ঘটনা, একটি কাফেলা একস্থানে শিবির স্থাপন করে কিন্তু সফরের ক্লান্তির কারণে ফজরের নামাযের জন্য সময়মতো কারো চোখ খুলেনি, সবার চোখ বিলম্বে খুলেছে। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, এস্থান পরিত্যাগ কর, এখানে অবস্থান করো না। তারপর কিছুদূর গিয়ে অযু ইত্যাদী করে নামায আদায় করেন। এরপর একজন সাহাবী নিজ পিপাসার কথা বলেন যে, তৃষ্ণা পাচ্ছে, সেখানে পানি স্বল্পতা ছিল। তিনি (সা.) তাঁর দু'জন সাথীকে পানি আনার জন্য পাঠান। এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌তা'লা কি কি ব্যবস্থা করেছেন যা আপন জনদেরও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে আর অপরকেও হতবাক করেছে। এটি একটি সুদীর্ঘ হাদিস, প্রথম অংশ বাদ দিয়ে আমি এটুকু নিচ্ছি। লিখা হয়েছে, "লোকেরা তাঁর কাছে পিপাসার কথা বলেন, তিনি নেমে আসেন এবং কাউকে আহবান করেন আর হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমরা দু'জন যাও আর পানি খুঁজে আনো। তারা দু'জন বেড়িয়ে পড়লেন এবং একজন মহিলাকে উটের উপরে পানির দু'টি মশক (চামড়ার থলে)-এর মধ্যে বসা অবস্থায় দেখতে পান; তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পানি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? সে বলে, আমি গতকাল এসময় অমুকস্থানে পানি দেখেছি এখন আমাদের লোক পিছনে রয়েছে। তারা উভয়েই তাকে বলেন; চলো। সে জিজ্ঞেস করে কোথায়? তারা বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে। সেই মহিলা মুসলমান ছিলো না; বলে সেই যাকে সাবী বলা হয়। তাঁরা বলেন হ্যাঁ যাই বল, তুমি চলো। তাকে নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে পুরো ঘটনা শুনান। হযরত ইমরান (রা.) বলেন, তাঁরা তাকে উট থেকে নীচে নামিয়ে আনে এবং নবী করীম (সা.) একটি পেয়ালা চেয়ে পাঠান আর তাতে ঐ দুটি মশকের মুখ থেকে পানি ঢালেন আর ফিতা ও রশি দ্বারা উপরের মুখ বন্ধ করে দেন যেভাবে পূর্বে বন্ধ ছিল এবং নিচের মুখ খুলে দেন আর মানুষের মধ্যে ঘোষণা করেন, পানি ভরে নাও। পান কর আর পান করাও। তিনি বলেন, যে যতটুকু চেয়েছে পান করেছে আর পান করিয়েছে। এরপর তাঁর বর্ণনা হলো, সেই পানির প্রচুর পরিমান ব্যবহার হচ্ছিল আর সে মহিলা তা বিমূঢ় দাঁড়িয়ে দেখছিল, আমি একদিনের দূরত্ব থেকে পানি নিয়ে এসেছি জানি না এখন আমার পানির কি হবে। কিন্তু তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! সেই মশকের কাছ থেকে মানুষ এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে তা পূর্বের তুলনায় বেশী পূর্ণ, অর্থাৎ যখন সেই মহিলা পানির মশকদ্বয় নিয়ে এসেছিল। এত পানি বের করার পরও প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, পানির মশক খালি হবার পরিবর্তে পূর্বের তুলনায় বেশী পূর্ণ ছিল। নবী করীম (সা.) বলেন, এই মহিলার জন্য কিছু (তোহফা) একত্রিত কর। তিনি বলেন যে, তার জন্য শুকনো খেজুর, কিছু আটা এবং যৎসামান্য ছাতু ইত্যাদী একত্রিত করা হয় আর এভাবে তার জন্য যথেষ্ট খাবার জমা হয়ে যায়। সে মহিলাকে তার উটের উপর আরোহণ করানো হয় আর একটি কাপড়ে বেঁধে সেটি তাকে প্রদান করা হয়। তারপর আঁ-হযরত (সা.) বলেন, তুমি কি জান! আমরা তোমার পানি থেকে কিছুই কমাইনি কিন্তু আল্লাহ্‌ই আমদেরকে পান

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন জীবন্ত গ্রন্থ ছিল, সেই সময়ও সে অবস্থানুযায়ী তাদের জন্য নসীহত ছিল, তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করছিল। আজকে এযুগে যখন মানুষের সম্মুখে নিত্য নতুন বিষয়াদী ও আবিষ্কারাদী রয়েছে, এ সম্পর্কেও এই গ্রন্থ সংবাদ দিচ্ছে।

করিয়েছেন। তারপর সে নিজ গৃহবাসীদের কাছে ফিরে আসে আর কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, হে অমুক! তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে? সে বলল, আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। দু'ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয় আর তারা আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায় যাকে সাবী বলা হয় আর আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এই! এই! করেছেন এবং সে এই ও ঐ অর্থাৎ, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর দিকে ইঙ্গীত করে বলেন যে, এর মাঝে সবচেয়ে বড় জাদুকর।"

অতএব দেখুন! সেই বিরান অঞ্চলে যেখানে পানির কোন নাম গন্ধও ছিল না আল্লাহ্‌তা'লা সেই মহিলাকে পাঠিয়ে তাদের সবার জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন। এই হলেন ইসলামের প্রভু! যিনি অভাব দূর করেন। পিপাসার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। বাহ্যত সেই মহিলাকে একটি মাধ্যম বানিয়ে প্রকৃতির নিয়মকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু সেই পানিতে এত বরকত রেখে দিয়েছেন যে, তার পানির মশকে কমতির প্রশ্নই নেই বরং পানি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা সেই মহিলাকেও বিস্ময়াভিভূত করেছে। আঁ-হযরত (সা.) সেই মহিলাকে বলেছিলেন, এটি মনে কর না যে, তুমি আমাদেরকে পানি সরবরাহ কারী! এও মনে কর না যে, আমরা অন্যায় ভাবে তোমার পানি ছিনিয়ে নিয়েছি। এটি একটি বাহ্যিক মাধ্যম ছিল যা একজন মু'মিনের ব্যবহার করা উচিৎ নতুবা আমাদের পালনকর্তা এবং আমাদের অভাব মোচনকারী হচ্ছেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, যিনি আমাদেরকেও পান করিয়েছেন আর তোমার পানিতেও কোনরূপ ঘাটতি আসতে দেন নি। সে এ কথায় আশ্চার্যান্বিত হয়ে নিজ পরিবার-পরিজনকে বলেছে, তিনি এক বড় যাদুকর কিন্তু সে কি জানে যে, এটি যাদু নয়, এটি 'রব্বুল আলামীন' এর নিজ বান্দা ও তাঁর সঙ্গীদের প্রয়োজন পূরণার্থে তাঁর প্রতিপালন গুনের বর্হিঃপ্রকাশ ছিল।

তারপর যেভাবে আল্লাহতা'লা বলেছেন, আমার বান্দা যেন আমার বৈশিষ্ট্যের রঙ ধারণ করে; আঁ-হযরত (সা.)-এর তুলনায় বেশি কে এতে রঙিন হতে পারতো? তিনি সেই মহিলার পানিতে ঘাটতি না হওয়া সত্বেও বরং বৃদ্ধি পাওয়ার পরও তার এই সেবার কারণে তার জন্য খাদ্য-দ্রব্য একত্রিত করিয়ে তাকে প্রদান করেন। এটিও অনুগ্রহ ছিল যা 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি (সা.) করেছিলেন। এই মহিলা মুসলমানদের পানি পান করিয়ে অথবা আঁ-হযরত (সা.)-কে পানি পান করিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ থেকেও অংশ লাভ করেছে যাতে তার পানিতে কোন ঘাটতির সৃষ্টি হয়নি এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অনুগ্রহ থেকেও অংশ লাভ করেছে।

আরেকটি ঘটনা হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)'র যা বিভিন্ন রঙ্গে, বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এটিও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন গুনের বহিঃপ্রকাশ। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, 'রব্ব' এর একটি অর্থ হচ্ছে দরিদ্রের ক্ষুধা নিবারণকারীও। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-এর কাছ থেকে শুনি। তিনি (রা.) বলেন, "সেই সত্ত্বার কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রাথমিক দিনগুলোতে ক্ষুধার কারণে কিছুটা কষ্ট লাঘবের জন্য আমি নিজ পেটে পাথর বেঁধে নিতাম অথবা মাটির সাথে লাগিয়ে রাখতাম। একদিন আমি মানুষের চলাচলের পথে বসে পড়ি। আমার পাশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর কাছে একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে খাবার খাওয়াবেন, কিন্তু তিনি আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে চলে যান। তারপর হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করি তিনিও একইভাবে চলে যান। তিনি বলেন যে, এরপর আঁ-হযরত (সা.) যখন যাচ্ছিলেন তাঁর কাছেও এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করি। আমার অবস্থা তাঁর চোখে পড়ে, মুচকি হাসেন এবং আমার হৃদয়ের অবস্থা আন্দাজ করেন। তিনি (সা.) অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলেন, হে আবু হুরায়রাহ্! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, আমার সাথে আস। আমি তাঁর (সা.) পিছনে রওয়ানা হলাম। যখন তিনি (সা.) গৃহে পৌঁছে ভিতরে যাচ্ছিলেন, তিনি বলেন, আমিও ভিতরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি। আঁ-হযরত (সা.) অনুমতি প্রদান করেন, তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি ভিতরে যান। তিনি ভিতরে গিয়ে দেখেন, সেখানে দুধের একটি বাটি রাখা আছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন এই দুধ কোথেকে এসেছে? গৃহবাসীরা বলেন যে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক মহিলা তোহফা দিয়ে গেছেন। হুযূর (সা.) বলেন, আবু হুরায়রাহ্! তিনি বলেন, আমি বললাম; হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, 'সূফ্‌ফা' বাসীদের ডেকে আন। এরা সবাই ইসলামের অতিথি ছিলেন, তাদের কোন বাড়ী-ঘর বা ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল না। যখন হুযূরের কাছে সদকার জিনিষ-পত্র আসতো তখন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন স্বয়ং কিছুই খেতেন না আর যদি কোন উপহার আসতো তখন তিনি 'সুফ্‌ফা' বাসীদেরও পাঠাতেন আর নিজেও খেতেন। যাই

হোক তিনি বলেন, হুযূরের ডেকে আনার নির্দেশ; আমার একেবারেই মনঃপুত হয়নি। এক পেয়ালা মাত্র দুধ যদি এরা সবাই এসে যায় তাহলে এটুকু কার কি কাজে আসবে। আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেন পান করে কিছুটা শক্তি লাভ হয়। কিন্তু হুযূরের নির্দেশ তাই আমি সবাইকে ডেকে আনলাম। তারপরে তিনি বলেন, যখন সবাই এসে নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করেন তখন হুযূর (সা.) আমাকে নির্দেশ দেন যে, পর্যায়ক্রমে এ পেয়ালা সবার হাতে দাও। তিনি বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম এখন আমি আর এই দুধ পাবো না। যাই হোক তিনি বলেন, আমি প্রত্যেকের কাছে পেয়ালা নিয়ে গেলাম, সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতে থাকেন, সবশেষে আমি পেয়ালা আঁ-হযরত (সা.)-কে দিলে তিনি (সা.) আমার প্রতি তাকান এবং মুচকি হেসে বলেন, আবু হুরায়রাহ্! আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, এখনতো কেবল আমরা দু'জন বাকি আছি। আমি বললাম হুযূর সঠিক। একথা শুনে তিনি বলেন, বস এবং ভালোভাবে পান করো, যখন আমি শেষ করলাম তখন বলেন আবু হুরায়রাহ্ আরো পান করো। আমি আবার পান করতে থাকি, যখন আমি পেয়ালা থেকে মুখ সরাতাম তখন তিনি বলতেন, আবু হুরায়রাহ্ আরো পান করো, যখন আমার পেট পুরোপুরি ভরে গেল তখন আমি নিবেদন করি, যেই সত্ত্বা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! এখন আর কোনই জায়গা নেই। সুতরাং আমি পেয়ালা তাঁকে দিয়ে দেই। তিনি (সা.) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন তারপর বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে দুধ পান করেন। (বুখারী কিতাবুর্ রিক্বাক, বাব কাইফা কানা আইশুন্ নবীয়ে (সা.) ওয়া আসহাবিহি ওয়া তাখাল্লিহিম মিনাদ্ দুনইয়া)

এই হলেন 'রব্ব', যিনি সমগ্র জগতেরও প্রভু-প্রতিপালক, যিনি বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কিত নিয়মের অধীনে এক পেয়ালা দুধ সরবরাহ করেছেন তারপর তাতে এত বরকত দিয়েছেন যে, তা অনেক ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণে সক্ষম হয়েছে।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম (সা.) সেহ্‌রী না খেয়ে রোযা রাখতে বারণ করেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো সেহ্‌রী না খেয়েই রোযা রাখেন? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমার প্রভু আমাকে আহার ও পান করান। অনেক সময় হয়ত এমন এমনও এসে থাকে যখন ক্ষুধা তেমন একটা অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সেহ্‌রী ব্যতীত রোযা রাখা থেকে বিরত হয়নি তখন তিনি একদিন তাদের সাথে সেহ্‌রী না খেয়েই রোযা রাখেন, তারপর আরেকটি রোযা রাখেন, এরপর যখন মানুষ চাঁদ দেখতে পায় তখন হুযূর (সা.) বলেন, যদি চাঁদ না দেখা যেত তাহলে আমি বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তোমাদের সাথে এভাবে রোযা রাখতাম। বস্তুত এদের বিরত না হবার কারণে শাস্তি স্বরূপ এবং এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের সামর্থ আমার সমান হতে পারে না, আমিতো আল্লাহ্‌র নবী। (বুখারী কিতাবুস সওমে বাবুত্ তাফকীলে লিমান আকসারাল ওয়াসালা)

এযুগে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর নিষ্ঠাবান দাস এর সাথে আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যবহার করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একাধারে ছয় মাস রোযা রেখেছেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার যৌবনে দৈবক্রমে একজন প্রবীণ বুযুর্গ স্বপ্নে দেখা দেন; তিনি বলেন যে, ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে পথ-প্রদর্শিত হওয়ার জন্য কখনও কখনও রোযা রাখা নবী-পরিবারের সুন্নত।"** অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লার যে নূর তাথেকে অংশ লাভের জন্য এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে রোযা রাখাও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুনড়বত, নবীদের রীতি। **"এ কথার প্রতি ইঙ্গীত করেছেন যে, আমি যেন আহলে বাইত ও রসুলদের এই সুন্নতকে অবলম্বন করি।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ সময়ে আমাকে আশ্চর্য ধরণের দিব্যদর্শন দেখানো হয়। কয়েকজন সাবেক নবী এবং আউলিয়ার সাথে সাক্ষাত হয়। একবারে জাগ্রত অবস্থায় আমি আঁ-হযরত (সা.), হযরত হুসাইন (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দর্শন করি।"

তারপর বলেন, "যখন আমি একাধারে ছয় মাস রোযা রাখি তখন নবীদের একটি দলের সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তাঁরা বলেন, তুমি কেন নিজেকে কষ্টে নিপতিত করেছ এথেকে বেরিয়ে এস।" তিনি বলেন যে, "মানুষ যখন এভাবে নিজেকে খোদার পথে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে তখন তিনি পিতা-মাতার ন্যায় দয়াপরবশ হয়ে তাকে বলেন, তুমি কেন কষ্টে নিপতিত।" এভাবে নিজ বান্দার প্রতি খেয়াল রাখাও প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যেরই কল্যাণ। যাইহোক নবীদের সাথে আল্লাহ্‌তা'লার স্বতন্ত্র আচরণ হয়ে থাকে, আঁ-হযরত

(সা.)-এর সত্ত্বায় এর সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটেছে এবং প্রত্যেকের সাথে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে হয়ে থাকে।

এ রোযার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহার্য্য ছিল মাত্র কয়েক গ্রাস বরং লিখিত আছে তা কয়েক তোলায় নেমে আসে। নিজ মনিবের দাসত্বে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এই জ্যোতি প্রদর্শন করছিলেন কিন্তু সবাই এটি করতে পারবে না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এই কষ্ট সাধ্যাতীত ছিল এবং ক্ষমতার বাহীরে তাই আঁ-হযরত (সা.) সেহ্‌রী না খেয়ে রোযা রাখতে স্বয়ং বারণ করেছেন।

আরেকটি ঘটনা! যা নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত হয় তাও আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তগত। যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষুধার্তদের আহার করানো হয় এবং এক হাজার সাহাবী (রা.) আহার করেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন একজন সাহাবী ঘরে গিয়ে স্ত্রী'কে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কোন খাবার আছে কি? আমি আঁ-হযরত (সা.)-এর অবস্থা দেখেছি। ক্ষুধার কারণে অবস্থা বড়ই কষ্টদায়ক, আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি বলেন, ছোট্ট একটি ছাগল আর সামান্য পরিমাণ আটা আছে। তিনি ছাগল জবেহ্ করে বলেন এটি রান্না কর আর আটা মাখাও আমি ডেকে আনছি। তাঁর নাম ছিল জাবের (রা.)। বলেন যে, আমি গিয়ে অত্যন্ত নিম্ন স্বরে যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়, আঁ-হযরত (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে কিছু মাংস আর যবের আটা আছে, আমি আমার স্ত্রী'কে তা রান্না করার জন্য বলে এসেছি, আপনি কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন এবং আহার করুন। হুযূর (সা.) প্রথমে চতুর্দিকে তাকান এবং ডেকে বলেন, সকল আনসার আর মুহাজির আমার সাথে চল, খাবার খেয়ে নাও, জাবের আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি বলেন যে, ডাক শুনে প্রায় এক হাজার মানুষ ক্ষুধায় যাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সেই সাহাবীরা তাঁর (সা.) সঙ্গী হন। আঁ-হযরত (সা.) বলেন যাও এবং তোমার স্ত্রী'কে বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না আসবো পাতিল চুলা থেকে যেন না নামায় আর রুটি বানানোও আরম্ভ না করে। তিনি গিয়ে স্ত্রী'কে জানালে তিনি বলেন, এখন কি হবে? কিন্তু আঁ-হযরত (সা.) যেখানে খাবার রান্না করা হচ্ছিল সেখানে পৌঁছেই অতি নিশ্চিন্তে পাতিল এবং আটার উপর দোয়া করেন। তারপর তিনি (সা.) বলেন, রুটি বানানো আরম্ভ কর। এরপরে তিনি (সা.) ধীরে ধীরে খাবার বিতরণ আরম্ভ করেন। জাবের (রা.) বলেন, সেই সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই খাবার থেকে সবাই পেট পুরে আহার করেছেন আর তখনও আমাদের পাতিল সেভাবে টগবগ করে ফুটছিল আর রুটি পূর্ববৎ বানানো হচ্ছিল। (বুখারী কিতাবুল মাগাযী হালাতো গায্‌ওয়াতে আহযাব, ওয়া ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড. ৩০৪-৩০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশও রয়েছে যে, তোমরা আমার রঙে রঙিন হও, আমার গুনাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন পরস্পরের প্রতিও যত্নবান হয়। এরফলে তারা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

সুতরাং এটি আল্লাহ্‌তা'লার অদ্ভুত আচরণ, বাহ্যিক উপকরণ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু যেভাবে প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যর অর্থ ক্ষুধার্তকে আহার করানো চাহিদা পূরণ ও অভাব দূর করা, তিনি এভাবে সামান্য জাগতিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশও রয়েছে যে, তোমরা আমার রঙে রঙিন হও, আমার গুনাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন পরস্পরের প্রতিও যত্নবান হয়। এরফলে তারা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদার প্রতিপালন অর্থাৎ, মানব জাতি এবং মানুষ বহির্ভূতদের অভিভাবক হওয়া এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীকেও নিজ অভিভাবকত্বের গুন থেকে বঞ্চিত না রাখা; এটি এমন একটি কাজ যদি এক খোদার ইবাদত করার দাবীকারী খোদার এই বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসার চোখে দেখে আর তাঁকে পছন্দ করে, এমনকি পরম ভালবাসার কারণে এই ঐশী গুনের পূজারী হয়ে যায় তাহলে এই বৈশিষ্ট্য ও গুন নিজের মাঝে ধারণ করা তার জন্য আবশ্যক যেন নিজ প্রেমাস্পদের রঙ এ রঙিন হতে পারে। (ইশতেহার ওয়াজিবুল ইজহার. ৪ঠা নভেম্বর-১৯০০, তিরইয়াকুল কুলুবে পরিবেশিত; তফসীর, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১ম খন্ড-১৮৬ পৃষ্ঠা)

এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মুরব্বী হওয়া এবং নিজ লালন-পালনের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত না করা, এটি মানবের কাজ। এখানে মুরব্বী অর্থ কেবল তরবিয়তকারী নয় যা সাধারণ অর্থে প্রচলিত বরং এর অর্থ হচ্ছে,

তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিপালনকারী। আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙিন হতে হবে আর 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্'র নমুনা হতে হবে, এই বোধ-বুদ্ধি ও উপলব্ধি সাহাবীদের মধ্যে অনেক বেশি ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর উপর অনুশীলন করতেন।

রেওয়ায়েতে এসেছে যে, "হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অনেক সাহায্য করতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল মিসতাহ্ বিন ইছাছাহ্। যখন 'ইফ্‌ক' (দূর্ণাম রটানো) এর ঘটনা ঘটেছিল তখন সেও হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা-বার্তা বলে আর তা

মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে। যখন পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা.) নির্দোষ প্রমাণিত হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কসম খান যে, আমি কখনই আর তাকে সাহায্য করবো না। কসম খাওয়ার পরে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, **'ওয়ালা ইয়া'তালি উলুল ফাযলি মিনকুম ওয়াস্‌সাআতি আইঁইউ'তু উলিল কুরবা ওয়ালমাসাকীনা ওয়াল্‌মুহাজিরীনা ফী সাবীলিল্লাহি, ওয়াল্‌ইয়া'ফু ওয়াল ইয়াছ্‌ফাহু, আলা তুহিববুনা আইঁইয়াগফিরাল্লাহু লাকুম; ওয়াল্লাহু গফুরুর রহীম'** (সূরাতুন্ নূর:২৩) অর্থাৎ, এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য প্রদান না করার কসম না খায়। তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। এরপরে হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় বৃত্তি প্রদান বহাল করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, আমি কখনই বৃত্তি বন্ধ করবো না।" আল্লাহ্‌তা'লার সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের আদর্শ এবং তাৎক্ষণিক প্রতিঁয়া এবং তাঁর শিক্ষার তত্ত্বজ্ঞানের ফলেই তৎক্ষণাৎ কসম ভাঙ্গেন যা ভঙ্গ করায় কোন পাপ নেই। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ পরিপন্থী যে কসম খাওয়া হয় তা ভঙ্গ করা বৈধ এবং আবশ্যক। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তাঁর প্রতিপালনের আওতায় তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, মানুষের সাথে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে দয়া আর ক্ষমাও আছে এবং অন্যান্য অনেক কল্যাণও রয়েছে, এথেকে বেশী বেশী অংশ লাভের জন্য তোমাদেরকেও তা অবলম্বন করা উচিৎ আর কোন জিনিষের বিরুদ্ধে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয়। অভাবী'র অভাব মোচন হওয়া উচিৎ। এমনটি বলা উচিৎ নয় যে, অমুক ব্যক্তি এমন; অমুক কর্মকর্তার সাথে ভালো সম্পর্ক নেই অথবা অমুককে অমুক, কথা ভুল বলেছে তাই যদি এর প্রয়োজনও থাকে তবুও তাকে সাহায্য করবো না। তার প্রয়োজন পূর্ণ করা, তাকে সাহায্য করা, তার ক্ষুধা নিবারণ করা একটি পৃথক বিষয় আর প্রশাসনিক বিষয়াদী আর সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ আলাদা বিষয়।

আঁ-হযরত (সা.) স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার গুনাবলী অবলম্বনের পরে অথবা এমন কাজ করার পরও যা আল্লাহ্‌তা'লারই বিশেষত্ব, এক বান্দা, বান্দাই থেকে যায় এবং প্রভুর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। কোন কোন সময় অনেকে মনে করে যে, আমরা যাদের অভাব দূর করছি হয়ত তাদের প্রভু হয়ে গেছি। সর্বাবস্থায় সে বান্দাই, সুতরাং প্রথমতঃ তাকে খোদার নির্দেশানুযায়ী কোমল ব্যবহার করা উচিৎ, দ্বিতীয়তঃ তিনি (সা.) এতটা সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ ভৃত্যকেও 'আবদী' অর্থাৎ, হে আমার বান্দা! বলে যেন না ডাকে কেননা তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা বরং সে যেন হে আমার ভৃত্য বলে ডাকে, আর কোন ভৃত্য যেন নিজ মালিককে 'রব্বী' অর্থাৎ, হে আমার প্রভু না বলে বরং 'সাইয়্যেদী' অর্থাৎ, হে আমার অভিভাবক! বলে ডাকে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আলফাজ বাবু হুকমিল্ ইত্‌লাকে লফজাতিল্ আবদী ওয়াল উম্মাহ্)

অতএব অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে, কারো মালিক হিসেবে তাকে লালন-পালনের দায়িত্ব আদায়ের পরও বান্দা বান্দাই থেকে যায় আর প্রভু প্রভুই। তাঁর গুনাবলী আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। যেহেতু মানুষের গন্ডি নির্ধারিত, তাই এসব সাবধানতার কথাও মানুষের স্মরণ রাখা উচিৎ।

যেভাবে গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, খোদাতা'লা এ যুগেও আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে মসীহ্ ও মাহদী দান করেছেন যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বা, 'রব্বুল আলামীন' এর বোধ-বুদ্ধি ও উপলব্ধি দান করিয়ে পূর্ববর্তীদের সাথে একত্রিত করেছেন। যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) নবী আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় 'রবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য শেষ করে দেননি বরং এই ধারা নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্‌তা'লার গুনাবলীর পরিচয় এবং এর উপলব্ধি অর্জন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে যেখানে 'রবু-বিয়্যত' বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি লাভ করিয়েছেন সেখানে তাঁর (আ.) সাথে আমাদের প্রিয় প্রভুর ব্যবহারের দৃশ্যও দেখা যায়, যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন। সুতরাং এ যুগে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন আবশ্যক ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি ঈমানকে দৃঢ় করা আর খোদাতা'লার অস্তিত্ব মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি।

পুনরায় তিনি বলেন, "খোদাকে চেনা নবীকে চেনার সাথে সম্পৃক্ত।" বলেন, "নবী খোদা দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।" এই আয়নার মাধ্যমেই খোদার চেহারা দৃশ্যমান হয়, যখন খোদা নিজেকে প্রকাশ করতে চান তখন নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যিনি খোদার শক্তির বিকাশস্থল আর তাঁর উপর স্বীয় ওহী অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে নিজ প্রভুত্বের শক্তি প্রদর্শন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদাতা'লা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' আয়াত দিয়ে পবিত্র কুরআনের সূচনা করেছেন। তিনি কুরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, একথা সত্য নয় যে, বিশেষ জাতিতে বা কোন বিশেষ দেশে খোদার নবী আসেন; বরং খোদা কোন জাতি ও কোন দেশকেই ভুলেন নি। কুরআন শরীফে বিভিন্ন দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, যেভাবে খোদা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী দৈহিক প্রতিপালন করে আসছেন সেভাবেই তিনি প্রত্যেক দেশকে ও জাতিকে আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের মাধ্যমেও কল্যাণমন্ডিত করেছেন, যেমন তিনি কুরআন শরীফে এক স্থানে বলেন, 'ওয়া ইম্‌মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফীহা নাযীর' (সুরাতুল ফাতির:২৫)

অর্থাৎ, এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন নবী বা রসূল পাঠানো হয় নি।

সুতরাং কোন তর্ক ছাড়াই এ কথা মেনে নেয়ার যোগ্য যে, ঐ সত্য ও কামেল খোদা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক যাঁর প্রতি প্রত্যেক বান্দার জন্য ঈমান আনা আবশ্যক। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাঁর প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, কোন বিশেষ যুগ পর্যন্তও নয় এবং না কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; বরং তিনি সকল জাতির প্রভু-প্রতিপালক, সকল জায়গার প্রভু-প্রতিপালক এবং সকল দেশের তিনিই প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই সকল কল্যাণের উৎসস্থল এবং সকল দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তার সত্বা থেকে উৎসারিত। সকল সৃষ্ট বস্তু তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত হচ্ছে এবং সকল অস্তিত্বের তিনিই ভরসাস্থল।

খোদার কল্যাণ সার্বজনীন। তা সকল জাতি, দেশ ও যুগকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর কারণ হলো, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং একথা বলতে না পারে খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কিন্তু আমাদের প্রতি তা করেন নি বা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েতের জন্য ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি বা অমুক যুগে তিনি তাঁর ওহী ও নিদর্শনসহ প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের যুগে তিনি লুক্কায়িত রয়েছেন। অতএব তিনি সার্বজনীন অনুগ্রহ দেখিয়ে এ সকল আপত্তি খন্ডন করেছেন এবং নিজের ব্যাপক গুন এভাবে দেখিয়েছেন যে, কোন জাতিকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি এবং কোন যুগকেই তিনি দুর্ভাগা সাব্যস্ত করেন নি।" (পয়গামে সুলেহ্, রুহানী খাযায়েন, ২৩তম খন্ড-৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা)

অতীত কালে নবীরা নিজ নিজ জাতির জন্য আবির্ভূত হতেন। তারপর আঁ-হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে তাঁকে পুরো বিশ্ব জগতের জন্য 'রহমাতুল্লিল আলামীন' হিসেবে প্রেরণ করে গোটা বিশ্বকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন; আর বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "যেভাবে আঁ-হযরত (সা.) 'খাতামুল আম্বিয়া' সকল নবীর সম্মিলন স্থল ছিলেন সেভাবে এখন আমি 'খাতামুল খোলাফা' এবং এ যুগে পুরো বিশ্বের সংশোধন কল্পে প্রেরিত হয়েছি।" এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এই পয়গাম প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানো, যেন কেউ এটি মনে না করে যে, এই যুগে আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে কোন নবী আসেন নি বা এ কথা যেন কারো অজানা না থাকে। আমরা সৌভাগ্যবান! যারা এ যুগের ইমাম 'আল্লাহ্‌র নবীকে' মেনে আল্লাহ্‌তা'লার 'প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের' জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করেছি। তাই এতে উন্নতি করা এবং আরো বেশি কল্যাণমন্ডিত হবার চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব।

প্রতিপালন গুনের আলোকে হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্‌তা'লা যে ব্যবহার করেছেন এখন আমি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

শুরু থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জাগতিকতার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না এজন্য কোন জাগতিক কাজ-কর্ম করতেন না বরং সর্বদা কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ আর এতে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহ্‌তা'লার ধ্যানে মগ্ন থাকাই ছিল তাঁর কাজ। তাই জাগতিক প্রয়োজনাদী পূরণার্থে নিজ পিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হতো। তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এর সংবাদ দেন, একজন মানুষের স্বাভাবিক মানবসুলভ প্রবণতার কারণে তিনি চিন্তিত হলেন, এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "হযরত মরহুম আব্বা জানের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানহু'র পক্ষ থেকে এই ইলহাম হয়েছে যা আমি এখনই উল্লেখ করেছি" এই ইলহাম আমি এখানে বর্ণনা করিনি, যাই হোক একটি ইলহাম হয়েছিল, 'মৃত্যু সন্নিকটবর্তী'। মানবিক কারণে আমার ধারণা হল আয়ের বিভিন্ন মাধ্যম পিতার জীবিত থাকার সাথে সম্পৃক্ত এরপরে না জানি আমরা কোন্ কোন্ পরীক্ষায় নিপতিত হবো। তখনই দ্বিতীয় ইলহাম **'আলাই সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু'** হয় অর্থাৎ, খোদা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়। এই ইলহাম বিস্ময়কর প্রশান্তি এবং নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং লৌহ কিলকের ন্যায় আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। সুতরাং মহিমা ও প্রতাপশালী খোদার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি তাঁর এই শুভসংবাদরূপী ইলহামকে এভাবে আমার জন্য বাস্তবায়িত করেছেন, যা আমার ধারণা এবং চিন্তাতীত ছিল। তিনি এরূপভাবে আমার অভিভাবকত্ব করেছেন যে, কখনও কারো পিতাও এমন দায়িত্ব পালন করেন না।" (কিতাবুল বারিয়্যাহ্, রূহানী খাযায়েন ১৩তম খন্ড, ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা)

একটি ইলহামী দোয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,"খোদাতা'লা ইতোপূর্বে কয়েকবার ইলহামের আকারে এই অধমের মুখে এই দোয়া জারী করেছিলেন যে, **'রব্বিজ্ আলনী মুবারাকান হাইসু মা কুনতু'** অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এমন কল্যাণমন্ডিত কর; যেখানেই আমি থাকি না কেন কল্যাণ যেন আমার সাথী হয়। তারপর খোদা স্বীয় স্নেহ ও অনুগ্রহে সেই দোয়া কবুল করেন যা তিনি নিজেই শিখিয়েছিলেন।" প্রথমে দোয়া শিখিয়েছেন তারপর কবুল করেছেন। "আর প্রথমে তারই ইলহামের আকারে মুখে প্রশ্ন জারি করা পুনরায় একথা বলা যে, তোমার আবেদন গৃহীত হলো এটি বান্দার অদ্ভুত মূল্যায়ন।" (বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড ৬২১ পৃষ্ঠার ৩ নাম্বার পাদটিকা।

> হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "যেভাবে আঁ-হযরত (সা.) 'খাতামুল আম্বিয়া' সকল নবীর সম্মিলন স্থল ছিলেন সেভাবে এখন আমি 'খাতামুল খোলাফা' এবং এ যুগে পুরো বিশ্বের সংশোধন কল্পে প্রেরিত হয়েছি।"

এধরণের অগনিত ইলহাম রয়েছে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে দোয়া শিখিয়েছেন এবং তা কবুল করেছেন। সুতরাং যেখানে এগুলো দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন, সেখানে প্রতিপালন বৈশিষ্টেরও বহির্প্রকাশ। আরো দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:-

একটি ইলহাম হচ্ছে, **'রব্বি আখ্‌খির ওয়াক্‌তা হাযা, আখ্‌খারাহুল্লাহু ইলা ওয়াক্‌তিন মুসাম্মা'** অর্থাৎ, হে মহিমান্বিত খোদা! ভুমিকম্প আগমনকে কিছুটা বিলম্বিত কর।

পরবর্তী অংশ হচ্ছে, **'আখ্‌খারাহুল্লাহু ইলা ওয়াক্‌তিন মুসাম্মা'** অর্থাৎ, খোদা; কিয়ামত সদৃশ ভুমিকম্পকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন। (তাযকিরাহ্: ৫৫৬-৫৫৭ পৃষ্ঠা)

এরপরে **'রব্বি আখরিজনী মিনান্ নার'** অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে আগুন থেকে নিস্কৃতি প্রদান কর।

পুনরায় পরের অংশ ইলহাম হয়েছে, **'আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাযী আখ্‌রাজানী মিনান্ নার'** অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (তাযকিরাহ্: ৬১২ পৃষ্ঠা)

এখানেও পূর্বে দোয়া শিখিয়েছেন পরে কবুল করার প্রমাণ।

আরেকটি দোয়া **'রব্বি আরিনী আনওয়ারাকাল কুল্লিয়্যাহ্'** অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ঐ সকল জ্যোতি দেখাও যা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। **'ইন্নি আনারতুকা ওয়া আখ্‌তারতুকা'** অর্থাৎ, আমি তোমাকে জ্যোতির্মন্ডিত করেছি এবং তোমাকে নির্বাচিত করেছি। (তাযকিরাহ্: ৫৩৪ পৃষ্ঠা) এখানেও একই ব্যবহার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কয়েক দিন হল, আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক স্থানে বসে আছি হঠাৎ দেখি অদৃশ্য থেকে আমার সামনে কিছু টাকা এসেছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কোথা থেকে এল। পরিশেষে আমার মনে হল, খোদাতা'লার ফিরিশতা আমাদের প্রয়োজনে এখানে রেখেছে।

তারপর ইলহাম হল, 'ইন্নি মুরসিলুন ইলাইকুম হাদীয়্যাতান' অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি সাথে সাথে আমার হৃদয়ে এর যে তা'বীর ইলকা হলো তা হচ্ছে; আমাদের নিষ্ঠাবান বন্ধু হাজী শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব এক ফিরিশতার রূপ ধারণ করবেন আর সম্ভবত তিনি টাকা পাঠাবেন এবং এই স্বপ্নকে আরবী ভাষায় নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। (শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাজী'কে লিখিত ৬ই মার্চ, ১৮৯৫ সনের চিঠি, মকতুবাতে আহমদীয়া-৫ম খন্ড, প্রথমাংশের ৩য় পৃষ্ঠা, তাযকিরা.২২৫-২২৬ পৃষ্ঠার বরাতে)

তারপর এর সত্যায়ন হয়েছে আর ইলহামও পূর্ণতা পেয়েছে।

তিনি বলেন যে, "১৮ বছর পূর্বের একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জায়া'লা লাকুমুহু ছিহ্‌রা ওয়ান্ নাসব' অনুবাদ-তিনি সত্য খোদা যিনি তোমার বৈবাহিক সম্পর্ক একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে করেছেন যারা সৈয়্যদ, আর তোমার বংশকে সম্ভ্রান্ত করেছেন.....।"

তিনি বলেন, "এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অন্যান্য ইলহামে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি শহরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে যা হলো দিল্লি।" এটি হযরত আম্মা জানের সাথে দ্বিতীয় বিবাহের সময়কার ঘটনা। "এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেককে শুনানো হয়েছিল.....এবং যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কার্যতঃ ঠিক সেভাবেই পুর্ণ হয়েছে, কেননা কোন পূর্ব আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই সৌভাগ্যবশত দিল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ পরিবারে আমার বিয়ে হয়।"

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমার বংশের মাধ্যমে ইসলামের হেফাযতের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রাখা হবে এবং তাথেকে সেই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যে নিজের মাঝে ঐশী আত্মা ধারণ করবে। তাই তিনি পছন্দ করেছেন যেন ঐ পরিবারের মেয়ে আমার বিবাহ বন্ধনে আসে আর তাঁর গর্ভে যেন সেই সন্তানের জন্ম হয় যে বিশ্বে আমার হস্তে সৃষ্ট জ্যোতির ব্যাপক প্রসার করবে। এটি বিস্ময়কর দৈবব্যপার, যেভাবে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সন্তানদের দাদীর নাম শহর বানু ছিল অনুরূপভাবে আমার এই স্ত্রী যিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের মা হবেন তাঁর নাম নুসরাত জাহাঁ বেগম। শুভলক্ষণ হিসেবে এটি এদিকে ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয় যে, খোদা সমগ্র বিশ্বের সাহায্যের লক্ষ্যে আমার ভবিষ্যত বংশের ভিত্তি রেখেছেন। এটি খোদাতা'লার রীতি যে, কোন কোন সময় নামের মধ্যেই এর ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত থাকে।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন-১৫তম খন্ড, ২৭৩-২৭৫ পৃষ্ঠা)

অতএব দেখুন! কোথায় সে সময় যখন পিতার অন্তর্ধানের সংবাদে তিনি (আ.) বিচলিত ছিলেন যে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এখন কোত্থেকে আসবে। আর, কোথায় আল্লাহ্‌তা'লার নিশ্চয়তা প্রদান যে, 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন্ আবদাহু'। এই নিশ্চয়তা দিয়ে,আশ্বস্ত করে সেই 'রব্বুল আলামীন' পুরো বিশ্বের সাহায্যের জন্য তাঁর (আ.) বংশের ভিত্তি রেখেছেন। তারপর এটিও যে, এই বংশের ভিত্তি; যাদের সমগ্র বিশ্বের সহায়তা করতে হবে। এই হচ্ছে প্রভু-প্রতিপালক! যিনি আমাদেরকে আঁ-হযরত (সা.)-এর সত্যিকার দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে স্বীয় চেহারা প্রদর্শন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদাতা'লা বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমিই তোমাদের প্রতিপালন করে থাকি। যদি খোদতা'লা প্রতিপালন না করেন তাহলে অন্য কেউ লালন-পালন করতে পারে না। দেখ! যখন খোদাতা'লা কাউকে অসুস্থ্য সাব্যস্ত করেন তখন অনেক সময় চিকিৎসক যারপর নাই চেষ্টা করে কিন্তু সে মারা যায়। প্লেগ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ! ডাক্তার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু এই রোগ দূর হয়নি। আসল কথা হচ্ছে, সকল কল্যাণ তাঁর পক্ষ থেকেই আর তিনিই সকল কষ্ট দূরীভূত করেন।"

পুনরায় বলেন, 'আল্‌হামদুলিল্লাহি রবিবল আলামীন' (সূরাতুল ফাতেহা:২) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক আর সমগ্র জগতের মালিক।" (বদর নাম্বার ২৪, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা; ৩রা জুলাই, ১৯০৩ সন-মলফুযাত-নব সংস্করণ; ৩য় খন্ড ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

পরিশেষে আঁ-হযরত (সা.)-এর একটি দোয়া পাঠ করছি, হাদিসে এভাবে তার উল্লেখ রয়েছে। "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উৎকণ্ঠার সময় এই দোয়া করতেন; আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি সবচেয়ে বড় এবং সহিষ্ণু, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, যিনি মহান আরশের রব্ব, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সম্মাণিত আরশের প্রভু-প্রতিপালক।

(বুখারী কিতাবুদ্ দাওয়াত বাবুদ্ দোয়ায়ে ইনদাল কুরব)

আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বা এবং 'রব্বুল আলামীন' এর সম্মুখে সমর্পিত থাকা ছিল প্রকৃতপক্ষে আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রাত্যহিক রীতি-নীতি। হতে পারে বর্ণনাকারী কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে একান্ত একাগ্রতার সাথে এই দোয়া করতে দেখেছেন আর তা প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, এটি একটি সম্পূর্ণ দোয়া যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে স্বীয় প্রভুর সত্যিকার পরিচয় লাভের তৌফিক দিন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত) [পুনঃমুদ্রিত]

ইকামাতিস্ সালাত

মূল ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ
ইমাম, মসজিদ ফযল, লন্ডন

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ নামাযে উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতা লাভের উদ্দেশ্যে কেবল দোয়ার ব্যবস্থাপনাই দেন নি বরং দোয়ার নির্ধারিত কথাগুলোও শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেছেন,

'খোদা তাআলার কাছে খুই আবেগ ও একটি উৎসাহ নিয়ে এ দোয়া করা আবশ্যক। যেভাবে ফল ও বিভিন্ন জিনিষে স্বাদ দিয়েছো সেভাবে নামায ও ইবাদতেও একবার স্বাদ লাভ ফিরিয়ে দাও' (মলফূযাত, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৩)।

যেন কবির ভাষায় এভাবে বলতে হয় ঃ

'হে খোদা প্রতিদিন পেয়ে থাকি যে স্বাদ (তব) দুনিয়ার,
ইবাদতের স্বাদও তো (মোর) পাইয়ে দাও একবার॥

আবার তিনি (রা.) বলেছেন, নামাযের প্রতি রাকাআতে দাঁড়িয়ে এ কথায় দোয়া করেতে থাক ঃ

"হে সর্বশক্তিমান ও মহা প্রতাপান্বিত খোদা! আমি পাপী বান্দা আর পাপের বিষ আমার অন্তর ও শিরা উপশিরায় এত প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, নামাযে আমার ভাবাবেগ ও একাগ্রতা লাভ হয় না। তুমি তোমার আশিস ও দয়ায় আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। আমার অন্তর কোমল করে দাও এবং আমার অন্তরে তোমার মাহাত্ম্য, ভীতি ও ভালবাসা ভরে দাও যেন এর মাধ্যমে অন্তরের কাঠিন্য দূর হয়ে নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়' (ফতওয়া মসীহে মাওউদ, পৃষ্ঠা ৩৭, ১৯৩৫ সনে মুদ্রিত)।

পুনঃ হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ কথায়ও দোয়া করা আবশ্যক।

'হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমি কেমন অন্ধ এবং দৃষ্টিহীন আর আমি বর্তমানে একেবারেই মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি, কিছু সময় পরে আমার ডাক আসবে। তখন আমি তোমার কাছে চলে আসবো। সে সময় কেউ আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার প্রাণ অন্ধ ও অজ্ঞ। তুমি এতে এমন জ্যোতির শিখা অবতীর্ণ কর এতে এটা যেন তোমার প্রতি আকর্ষণ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে দেয়। তুমি এমন আশিস বর্ষণ কর যেন আমি দৃষ্টিহীন না উঠি এবং অন্ধদের সাথে গিয়ে একত্র না হই'

(তিনি-আ.) বলেন, এরকম দোয় যখন করা হবে এবং এর ওপর স্থায়ী থাকবে তখন সে দেখতে পাবে তার ক্ষেত্রে এমন একটি সময় আসবে যে নামাযে এ নিরুৎসাহ ভাবের ওপর আকাশ থেকে একটি জিনিষ আপতিত হবে, যা ভাবাবেগ ও কোমলতা সৃষ্টি করে দেবে' (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৬, নতুন সংস্করণ)।

হুযূর আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের নির্দেশাবলী

সাইয়্যেদেনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রারম্ভিক দিকে দোয়া, ইবাদত এবং বিশেষভাবে ইকামাতে সালাতের ওপর বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্মরণ করানোর লক্ষ্যে হুযূর (আই.)-এর ২টি নির্দেশ উপস্থাপন করছি ঃ

তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত কর এবং যথাযথভাবে ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না। নামাযের সময়ে, যেভাবে খোদা তাআলা আদেশ দিয়েছেন, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখ। তোমাদের কাজ এবং তোমাদের অন্য বাহানা যেন তোমাদের নামায পড়া থেকে বিরত না রাখে। কাজের খাতিরে নামায পরিহার করো না। নামাযের খাতিরে কাজ পরিহার কর নচেৎ এ-ও এক প্রকার গুপ্ত শির্ক। কেননা, কাজের খাতিরে যদি নামায পরিহার কর তাহলে এর এই অর্থ হবে, তোমাদের দৃষ্টিতে পার্থিব কাজ খোদার ইবাদত করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

পুনঃ হুযূর (আঃ) বলেন ঃ

'যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত হতে চায়, তাঁর নৈকট্য লাভ করতে চায়, শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা চায় সেক্ষেত্রে তার জন্যে একটাই মাধ্যম যেন ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং এজন্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বাজামাত নামায আদায় করা' (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৮ জানুয়ারী, ২০০৫)।

ইকামাতে সালাতের প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ!

ইকামাতে সালাতের ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা

কিছুটা জানতে পেরেছি। আসুন, একটু দেখে নেই বাস্তবতার বিশ্বে ইকামাতে সালাতের কোন্ সেই পবিত্র আদর্শ আমাদের কার্যকরী আহ্বান জানাচ্ছেন। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ ওয়া তাবারক তাআলা যে সত্তাকে সারা বিশ্বে এবং সব যুগের জন্যে উত্তম আদর্শ নির্ধারণ করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রভু ও নেতা (আমার মা বাবা তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত) মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা। তিনি (সা.) ইকামাতে সালাতের দায়িত্ব এমন সুন্দরভাবে আদায় করেছেন যে একদিকে খোদা তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার (সা.) নামায, তাঁর ইবাদত, তাঁর জীবন, তাঁর মরণ সবই ছিল সারা বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে তাঁর (সা.) বিরুদ্ধবাদীরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে **'আশেকা মুহাম্মাদুন রাব্বাহু'** অর্থাৎ মুহাম্মদ তো মন প্রাণ দিয়ে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রেমিক বনে গেছে! রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছেন, হে লোকেরা! তোমাদের দুনিয়ার ৩টি জিনিষের আমার খুবই পসন্দের। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, **কুররাতা আয়নি ফিস্ সালাত** অর্থাৎ আমার চোখের প্রকৃত শীতলতা এবং তৃপ্তি নামায আদায়ের মাঝে। ইকামাতে সালাত তাঁর (সা.) পূর্ণ আদর্শ সারা জীবনে ব্যাপ্ত রয়েছে। বাজামাতে নামাযের ধারা ইসলামের সূচনা কাল থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। আবার সারা জীবনে যাত্রা পথে ও বিরতিতে, রোগ-ব্যাধি ও সুস্থাবস্থায়, যুদ্ধাবস্থায় বা নিরাপত্তাবস্থায়–প্রত্যেক অবস্থায়ই এ অবশ্যকরণীয় কাজে কখনো কোন দুর্বলতা আসতে দেন নি। যাত্রাপথে নামাযের সময় এলে কাফেলা থামিয়ে 'কসর' ও জমা' করে বাজামাত নামায আদায় করতেন। বর্ষা বৃষ্টির সময়ে কখনো কখনো বাহনে চড়েও তিনি (সাঃ) নামায আদায় করেছেন এবং কোন বাহানাকে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে প্রচন্ড আঘাত পান। দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব ছিল না। অথচ তিনি (সা.) বাজামাত নামায পরিহার করা পসন্দ করলেন না এবং বসে নামায পড়লেন (বুখারী)। বদরের যুদ্ধের সময় একটি ছোট তাঁবুতে তিনি (সা.) যেসব দোয়া করেছিলেন এর স্মরণ আজও অন্তরকে উদ্দীপ্ত করে থাকে। আত্মবিগলনের এমন জগৎ ছিল যে, কাঁধের চাদর বার বার নিচে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনার খাতিরে এসব বিষয়কে গৌণ করে নিজ প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি (সা.) স্বয়ং আক্রান্ত হয়ে পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং ৭০ জন সাহাবীর শহীদ হওয়ার দুঃখও ছিল। কিন্তু তিনি (সা.) এ দিনও রীতিমত বাজামাত নামায আদায় করেন। আহযাবের যুদ্ধে ব্যস্ততার কারণে নামায যুহর ও আসর নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে পারেন নি। সূর্য অস্তমিত হলো। তখন ইকামতে সালাতের প্রতি অসাধারণ ভালবাসার দরুন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (সা.) পবিত্র মুখ থেকে একথা বের হয়ে গেল খোদা এসব শত্রুদের ধ্বংস করে দিন যাদের কারণে আমাদের নামায পরে পড়তে হলো! (বুখারী)।

বর্ষা
বৃষ্টির সময়ে কখনো কখনো বাহনে চড়েও তিনি (সাঃ) নামায আদায় করেছেন এবং কোন বাহানাকে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে প্রচন্ড আঘাত পান। দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব ছিল না। অথচ তিনি (সা.) বাজামাত নামায পরিহার করা পসন্দ করলেন না এবং বসে নামায পড়লেন (বুখারী)।

ইকামাতে সালাতের একটি দিক হলো নামাযে বিনয় ও নম্রতা। সারওয়ারে কায়েনাৎ (সুষ্টির সেরা) মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামাযে এ মর্যাদা নিজ মি'রাজের আকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামান্য দৃষ্টিতে এ যুবককে দেখুন যিনি পার্থিব চমক এবং স্বাদ ও আনন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করে হেরা পর্বতে একাকী একাগ্রতার সাথে ইবাদতের মাধ্যমে নিজ অন্তরে প্রফুল্লতা লাভ করতেন। রাতের আঁধারে আধ্যাত্মিকতাকে আলোকোজ্জ্বল করতেন এবং নিজ প্রাণকে অস্থির করে তুলতেন। কেউ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামাযের অবস্থা সম্বন্ধে একটু বলুন। তখন তাঁর (রা.) উত্তর ছিল ঃ

'এ নামাযের সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা সম্পর্কে বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা আমি কোথায় পাব'? (বুখারী, কিতাবুস সওম)।

তিনি (সা.) নামাযে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর (সা.) পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। কেউ আরামের পরামর্শ দিলে তিনি (সা.) বলেছিলেন, 'আমি কি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দা হবো না'? তাঁর (সা.) সিজদার অবস্থা সম্বন্ধেও শুনে নিন। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, সিজদার অবস্থায় তাঁর (স.) কান্নাকাটির এ একটি জগৎ সৃষ্টি

হতো যেভাবে চুলোয় রাখা পাতিলে বলক উঠে বা যাতার দুটি পাটার ঘর্ষণে শব্দ হয়। এ অবস্থা মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। অবলীলায় মন থেকে দোয়া বের হয়ে আসে।

তব মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়ায় ছিল যে আকুতি

(হে প্রভু!) এর কিছুটা ঝলক দাও মম সিজদাতে কেবল (এ মিনতি)॥

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন। এক রাতে আমার চোখ খুলে গেলে আমি তাঁকে (সা.) বিছানায় দেখতে পেলাম না। মনে হলো হয়তো অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গিয়ে থাকবেন। অন্ধকারে আমি এদিকে সেদিকে অন্বেষণ করলাম। তখন আমি জানতে পারলাম তিনি (সা,) আরামের সেই বিছানা ছেড়ে কাছেই মাটিতে সিজদাবনত এবং দোয়ায় নিমগ্ন রয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন 'এটা দেখে আমি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলাম এবং মনে মনে বললাম, হে আয়েশা, কি ধারণা করেছিলে আর দেখ, খোদার রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোন জগতে বিচরণ করেছেন! (নিসাঈ)। 'একটি বর্ণনায় আছে, তাঁকে (সা.) নিকবর্তী কোন একস্থানে রাতের আঁধারে সিজদাবনত দেখতে পান। হযরত আয়েশা (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এক রাতে আমার এখানে এলেন। এ রাতে আমার এখানে তাঁর (সা.) থাকার পালা। শীত কালের ঠান্ডার কারণে যখন তিনি (সা.) লেপের নিচে এলেন তখন বললেন, আয়েশা! এ রাতটা আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতে কাটিয়ে দিতে চাই, তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে? আমি বললাম। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সন্তুষ্টিই তো আমার কাম্য। আমি সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি। অতএব তিনি (সা.) সেই রাতটি নামায ও কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে তাঁর (সা.) সিজদাস্থান পানিতে সিক্ত হয়ে গেল (ইমাম সাউতি)।

নামায প্রসঙ্গে রসূলে পাক (সা.)-এর প্রত্যয় ও উৎসাহের এমন এক জগৎ ছিল যে, জীবনের শেষ অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি (সা.) প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আর অচৈতন্য অবস্থা বিরাজমান ছিল। প্রকোপ কমানোর জন্যে পানি ঢালা হচ্ছিল। মসজিদে যাওয়ার জন্যে উঠলেন, আবার বেহুশ হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে এলে নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, সাহাবারা নামাযের অপেক্ষায় বসে আছেন। আবার শরীরে পানি ঢাললেন। জ্বরের প্রকোপ কম হলো। আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। পরে যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ হলো তখন দু'জন সাহাবার কাঁধে ভর করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। পা যেন মাটিতে হেঁচড়ে টেনে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) আবূ বকর (রা.)-এর পাশে বসে নামায পড়ালেন। আর ইকামাতে সালাতের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যা সব সময়ের জন্যে অনন্য হয়ে রইলো।

ইকামাতে সালাতে মসীহে পাক আলায়হেস সালামের দৃষ্টান্ত

আসুন এখন কয়েকটি ঘটনার আলোকে হযরত মসীহ পাক আলায়হেস সালামের পবিত্র জীবনে ইকামতে সালাতের অবস্থা বিশ্লেষণ করি। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় হলো ঐশী-প্রেম। তাঁর (আ.) গোটা জীবন এ ভালবাসায় বিলীন ছিল। নামায এবং ইবাদতের গুরুত্ব দেয়া ছিল অতুলনীয়। যৌবনের সূচনায় তাঁকে (আ.) 'মাসীতার' বলা হতো। অর্থাৎ তিনি (আ.) সেই ব্যক্তি যিনি সব সময় মসজদে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে থাকেন।

হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) লিখেছেন, ১৮৮২ সন থেকে হযরত আকদসের সেবায় উপস্থিত রয়েছি। তখন থেকে মৃত্যুর কিছুদিন আগ পর্যন্ত সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। হযরত (আ.)-কে সব সময় বাজামাত নামাযের পাবন্দ দেখতে পেয়েছি (তাযকিরাতুল মাহদী, পৃষ্ঠা ৮০)।

মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, মৃত্যুর ২/৩ বছর কাছাকাছি সময় যখনই হুযূর (আ.) নামায মাগরিব ও ইশার জন্যে বাইরে আসতে পারতেন না তখন ঘরেই মেয়ে লোক এবং শিশুদের একত্র করে বাজামাত নামায আদায় করতেন (বক্তৃতা জলসা সালানা, ১৯৩০)।

খুবই প্রাথমিক দিকে হুযূর (আ.) হাফেয মঈনুদ্দীন সাহেবকে কেবল এই উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে রাখতেন যেন এভাবে বাজামাত নামাযের সুযোগ লাভ হয়। মোকদ্দমার দিনগুলোতেও তিনি (আ.) কখনো কোন নামায কাযা হতে দেন নি।

হযরত মসীহে পাক (আ.)-এর নামাযের চিত্র তাঁর (আ.) সাহাবা কেরাম বেশ বর্ণনা করেছেন। হযরত হামেদ আলী সাহেব (রা.)-এর বর্ণনায় আছে। হুযূর (আ.) অসাধারণ ও কায়োমনোবাক্যে এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করে নামায আদায় আদায় করতেন। **ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম** শব্দগুলো বার বার উচ্চারণ করতেন এবং সিজদায় **'ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসৃতাগিস'** বার বার বলতেন, বার বার এ শব্দগুলোই বলতেন, যেভাবে কেউ কাতর অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটির সাথে

কোন বড় থেকে বড় জিনিষ চায় এবং বার বার কাঁদতে কাঁদতে নিজের প্রার্থিত বস্তুকে চাইতে থাকে হযরত সাহেব এমনই করতেন। সিজদা সাধারণভাবে অনেক দীর্ঘ হতো এবং কখনো কখনো এমন হতো যেন,এ কান্নাকাটিতে তিনি বিগলিত হয়ে (পানি ন্যায়) বয়ে যাবেন।

হযরত মসীহ্ পাক আলায়হেস সালামের নামায ও দোয়ার অবস্থার একটি সাক্ষ্য হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, যেদিনগুলোতে পাঞ্জাবে প্লেগের খুব প্রকোপ ছিল এবং লোকেরা বিপুল সংখ্যায় এ রোগের শিকার হচ্ছিল তিনি (আ.) মানবমন্ডলীর সহানুভূতির আবেগ নিয়ে তাদের জন্যে দোয়ায় লিপ্ত ছিলেন। অথচ এ প্লেগ তাঁর (আ.) সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছিল। যে আবেগ নিয়ে তিনি (আ.) দোয়া করেছিলেন এটা দেখে তিনি (অর্থাৎ সিয়ালকোটি সাহেব) বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) বলেন ঃ

'এ দোয়ায় তাঁর আকুতিতে এতটা ব্যথা ও বেদনা ছিল যে, কোন শ্রোতার পিত্ত পানি হয়ে যেত এবং তিনি (আ.) এমনভাবে ঐশী আস্তনায় পড়ে কান্নাকটি করছিলেন যেভাবে কোন মহিলা প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে থাকে। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। শুনতে পেলাম তিনি (আ.) খোদার সৃষ্টিকে প্লেগের আযাব থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে দোয়া করছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ্! এসব লোক যদি প্লেগের আযাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরে তোমার ইবাদত কে করবে?' (সীরাত মসীহ্ মাওউদ, ৩ খন্ড, পৃঃ ৩৯৫)।

তাহাজ্জুদ নামাযের নির্জনতা ছাড়া দিনের বেলায়ও সাধারণত তিনি একটি সময় একেবারেই পৃথকভাবে ইবাদতে কাটাতেন। শেষ বছরগুলোতে যখন তিনি (আ.) বায়তুদ্দোয়া বানিয়ে নেন তখন ভিতর থেকে বন্ধ করে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে একেবারে পৃথকভাবে ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। কখনো নির্জন স্থান অন্বেষণে বাইরে চলে যেতেন এবং নির্জনে বসে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন।

ইকামাতে সালাতের দিক এটাও, যেন নামাযের সময় নামাযকে অন্যান্য কাজ থেকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্ পাক আলায়হেস সালামের জীবন থেকে দিচ্ছি। হযরত আম্মাজান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহে পাক আলায়হেস সালাম নিজেই তাঁর (রা.) কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ

'একবার আমি কোন মোকদ্দমায় হাজিরা দিতে গেলাম। আদালতে আরও অনেক মোকদ্দমা হচ্ছিল। আমি বাইরে একটি গাছের নিচে অপেক্ষা করছিলাম। যেহেতু নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল তাই আমি সেখানেই নামায পড়া আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু নামায পড়ার মাঝেই আদালতে আমার হাজিরার ডাক পড়লো। কিন্তু আমি নামায পড়ছিলাম। আমি যখন নামায থেকে অবসর হলাম আমি দেখি আমার পাশে আদালতের চাপরাশি দাঁড়ানো রয়েছে। সালাম ফিরাতেই সে আমাকে বললো, মির্যা সাহেব! মোবারক হোক! আপনি মোকদ্দমা জিতে গেছেন' (সীরাতুল মাহদী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫)।

অতি কষ্ট এবং রুগ্ন অবস্থায়ও তিনি (আ.) সব সময় ইকামাতে সালাতের বন্দোবস্ত করতেন। এর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। এক খৃষ্টানের একটি পুস্তকের উত্তরে তিনি নূরুল হক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। মাত্র ৪/৫ পৃষ্ঠাই লিখেছেন তখনই হযরত আকদস (আ.)-এর মাথা ব্যাথার খুব কষ্ট আরম্ভ হলো। কষ্ট এতটা ছিল যে তিনি (আ.) ৩ দিন পর্যন্ত নামাযের জন্যে মসজিদে যেতে পারেন নি। চতুর্থ দিন কিছুটা সুস্থ হলে তিনি (আ.) ফজরের নামাযে মসজিদে গেলেন এবং খুব কষ্ট করে বসে বসে জামাতের সাথে নামায আদায় করলেন। সে সময় রোগের অবস্থা এমন ছিল, হযরত আকদস ঘর্মাক্ত কলেবরে ছিলেন এবং এতটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, নামাযের পর হযরত আর সেখানে বসতেও পারেন নি মসজিদেই শুয়ে পড়লেন (তাযকিরাতুল মাহদী, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইকামাতে সালাতের এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতি পদক্ষেপে রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আত্মা উৎফুল্ল হতে থাকে। এটা দেখে যে, এ প্রকৃত দাস কিভাবে প্রসিদ্ধ নেতা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র পদাঙ্ক পদে পদে অনুসরণ করেছেন

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় হলো ঐশী-প্রেম। তাঁর (আ.) গোটা জীবন এ ভালবাসায় বিলীন ছিল। নামায এবং ইবাদতের গুরুত্ব দেয়া ছিল অতুলনীয়। যৌবনের সূচনায় তাঁকে (আ.) 'মুসীতর' বলা হতো। অর্থাৎ তিনি (আ.) সেই ব্যক্তি যিনি সব সময় মসজদিে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে থাকেন।

আর অন্য দিকে তাঁর নিজ মনের অবস্থা এই, নিজ প্রাচুর্যদানকারী আল্লাহ্‌র ইবাদত শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছানোর পরও অন্তরে আফসোস এবং অনুতাপ অনুভব করতেন। এ ঘটনাটি একটু পাঠ করে দেখুন! একবার হযরত মসীহ পাক আলায়হেস সালামের যুগে কোন অমুসলিমের বাড়ীতে বিয়ে সাদী উপলক্ষ্যে একটি নর্তকী আনা হলো। সে সারা রাত নাচ গান করে কাটায়। তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি (আ.) খবর সংগ্রহ করালেন এ মর্মে যে, একটু বলুন তো এ হতভাগীকে সারা রাতের জন্য কী দেয়া হয়েছে? জনা গেল, কেবল ৫ টাকা দেয়া হয়েছে। ভোর বেলা হযরত মসীহ্ পাক (আ.) নিজের সাহেবাদের মাঝে এলেন এবং বল্লেন,

'এ মহিলা কেবল ৫ টাকার জন্যে কত পরিশ্রম করেছে। আমরা আমাদের অনুগ্রহশীল ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে হাজার হাজার বরং অসংখ্য ও অশেষ উপহার ও পুরস্কার পেয়েও এতটা পরিশ্রম করি না, এ ভেবে আমি তো সারা রাত লজ্জায় মরেই গিয়েছিলাম! এ ভাবেই রাত্রে যখন আমি পাহারাদারের ডাক শুনি তখনও লজ্জা পাই। ৪/৫ টাকা মাসিক বেতন পেয়ে সারা রাত পাহারা দিয়ে থাকে। ছোট রাতেও আরাম করে না। ঠান্ডা, বর্ষা বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এর তুলনায় আমরা কত অমনোযোগী হয়ে ঘুমিয়ে থাকি। মানুষ স্বয়ং নিজের মনে বিচার করে দেখুক' (আল ফযল, ১৬ আগষ্ট, ১৯৯৮)।

সম্মানিত শ্রোতৃমন্ডলী!

তাঁর (আঃ) প্রসিদ্ধ নেতা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর (সা.) প্রকৃত দাস (আ.)-এর ইকামাতে সালাতের এক সংক্ষিপ্ত ঝলক দেখলেন। এ সুযোগে আমরা সবাই এক মুহূর্ত থেমে পুরোপুরি বিশ্বস্ততার সাথে আত্মবিশ্লেষণ করি এবং গভীরভাবে চিন্তা করি, মহা সম্মানিত খোদার এসব মনোনীত ক্ষমাকৃত এবং নিষ্পাপ সত্তাদের নামায প্রতিষ্ঠার যদি এ অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মত পাপী ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ মানুষের এ ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী পদক্ষেপ রাখা প্রয়োজন? আমাদের মস্তক তো পাপভারে অবনমিত এবং যে নামায এসব পাপকে মোচনকারী ও খোদা তাআলার করুণাকে আকর্ষণকারী মাধ্যম আমাদের এ মাধ্যমকে কতটা অবলম্বন করেছি? নিজ সত্তাকে ঝাঁকুনি দেয়া প্রয়োজন। নিজ আত্মাকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ। খোদা করুন যেন আমাদের সত্তা জাগরিত হয় এবং আমাদের জীবনে এক পুণ্য ও পবিত্র বিপ্লব সাধিত হতে আরম্ভ করে।

শেষ কথা

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! নেযামে খিলাফত (খিলাফত ব্যবস্থা) এবং ইকামাতে সালাতের যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য। আয়াতে ইস্তিখলাফে (সূরা নূর ঃ ৫৬) আল্লাহ্ তাআলা **ইয়াবূদুনানী লা ইউশরিকূনা বী শাইয়া** বলে মু'মিনদের সাথে এ অঙ্গীকার করেছেন, খিলাফতের কল্যাণে তারা নিজেদের ইবাদত কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে পালনকারী হবে। মু'মিনদের জামাআত খিলাফতের ছায়ার অধীন ইবাদতকারীদের জামাতে পরিণত হবে এবং এর প্রত্যেক ব্যক্তি ইকামাতে সালাতের ঐশী আদেশের ওপর দৃষ্টান্তমূলকভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা নিবে। এরই ফলে আল্লাহ্ তাআলার একনিষ্ঠ তৌহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পুরস্কার তাদের লাভ হবে।

আর খিলাফতের মুকুট খোদা আহমদী জামাআতের মাথায় রেখেছেন এবং আমাদেরকেই আল্লাহ্ তাআলা এ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। আমরা আজ আহমদীয়তের ইতিহাসের সেই বাঁকে দাঁড়িয়ে আছি যখন আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। আর খিলাফতে আহমদীয়ার জুবিলীর সূর্য জামাআতের ওপর উদিত হতে যাচ্ছে। অতএব হে খিলাফতের উদ্দেশ্যে মাতোয়ারা এবং উৎসর্গকারীরা! আস, আমরা এ ঐশী পুরস্কার ও কল্যাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা, বাঁধন ও আনুগত্যের প্রকাশ এমনভাবে করি যে আজ এ সংকল্প ও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা করে এ সমাবেশ থেকে উঠে যাই যে, আমরা ইকামতে সালাতের ঐশী ফরমান নিজেদের ওপর এমনভাবে আরোপ করে নেব যেন এর প্রতিটি গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের সবার মাঝ দিয়ে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। নামায আমাদের আত্মার খোরাকে পরিণত হয়। নামায আমাদের চোখের স্নিগ্ধতায় পরিণত হয়। আর নামাযের মাধ্যমেই আমাদের আত্মার প্রকৃত শান্তি লাভ হয়। খোদা করুন আমরা এ অঙ্গীকারের ওপর সত্য মন নিয়ে, দৃঢ়সংকল্প সহকারে এবং প্রকৃত বিশ্বস্ততার সাথে কিছুটা হলেও এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই যেন আমাদের প্রত্যেক নামায ইকামাতে সালাতের সব স্তর উত্তীর্ণ করে যায়। আমরা জীবিত এবং সঞ্জীবনী নামাজসহ জীবিত থাকি এবং এমনই গ্রহণীয় নামায আদায় করতে করতে আমরা নিজেদের প্রাণ জীবনদাতা খোদার ওপর ন্যস্তকারী হই।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা 'আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (আর আমাদের শেষ দোয়া হলো, সব প্রশংসা গোটা বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র)।

অনুবাদ ঃ **আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রেমে এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)

কিছু এমন দিন আসে যা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও স্মরণীয়। তেমনি মার্চ মাসের ২৩ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কারণ এই দিনেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এ আধ্যাত্মিক জামাআতের সূচনা করেন ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ। এ ছাড়া এই মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতারও মাস, তাই বলতে পারি মার্চ মাস আমাদের কাছে অনেক মর্যাদাপূর্ণ ও মহান মাস।

আমরা সবাই জানি, যিনি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হবেন তিনি রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভালবাসা রাখবেন। তিনি এ যুগের সবচেয়ে বেশী তাঁর প্রতি দুরূদ প্রেরণকারী হবেন। এমন প্রতিশ্রুত ইমাম মহদী (আ.)-এর অপেক্ষায় লোকেরা এখনও অপেক্ষামান। একদল বলছেন সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী এখনও আসেন নাই। আর অপর একদল যুক্তি প্রমাণসহ বলছেন তিনি চলে এসেছেন এবং তিনি রসূল করীম (সা.)কে অসাধারণ ভালবাসা প্রকাশ করেছেন বলেই এ যুগের প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে খোদা তাআলা তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন আর তার নাম হচ্ছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। আমরা এখানে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হযরত রসূল করীম (সা.) কে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তা তুলে ধরব সংক্ষিপ্তাকারে। কারণ অনেকে এটাও বলে থাকেন যে, আহমদীয়া জামাআত যাকে ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করেন তিনি নাকি নিজেকে রসূল করীম (সা.)-এর চেয়ে বড় বলে প্রচার করে। নাউযুবিল্লাহ্! এমন অপপ্রচারও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে করা হয়। তাই চেষ্টা করব হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম কত ব্যাপক ছিল তা তুলে ধরতে যাতে আপত্তিকারীরা সহজেই বুঝতে পারেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যে, কখনো নিজেকে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর চেয়ে বড় মনে করতেন না। সুপ্রিয় পাঠক! তাই চলুন দেখি রসূল প্রেমে এই যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কি বলেছেন ঃ

"আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোন ক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) লিখেছেন ঃ "আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশর্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোন ক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিষের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এ জগতেই আপন জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই, যে বিশ্বাস করে আল-হ্ তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের মর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। অন্য কাউকে আল্লাহ্ তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরঞ্জীব" (কিশতিয়ে নূহ পৃঃ ১৩)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর সমস্ত রচনায় ও বক্তব্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের (সা.) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন : "আমি এখন কেবল আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য হিসেবে অতি জরুরী এ বিষয়টি জানাচ্ছি। আল-হ্ তাআলা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরক্ষিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমাকে তাঁর পক্ষ

থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এই রোগাক্রান্ত যুগে কুরআন শরীফের মাহাত্ম্য আর মহানবী মুহাম্মদ রসূলুল-াহ্ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আর খোদাপ্রদত্ত আত্মিক জ্যোতি অনুগ্রহরাজি ঐশীনিদর্শন ও খোদাপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ধর্মের ওপর আগমনকারী সকল শত্রুকে প্রতিহত করাও আমার কাজ" ('বারাকাতুদ্দোয়া' পুস্তক রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৪)।

প্রিয় পাঠক মহোদয়, এখন একটু ভেবে দেখুন, আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনকারীরা বলছেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নাকি নিজেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে উত্তম নবী বলে ঘোষণা করেছেন, নাউযুবিল্লাহ্। কিন্তু ইমাম মাহদী (আ.) নিজেই বলেছেন, "আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই।" যদি তিনি নিজেকে সেই মহান নবীর চেয়ে বড় মনে করতেন তাহলে খোদাতাআলাই তাকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু খোদাতাআলা তাকে ধ্বংস করেননি বরং সাড়া পৃথিবীতে দিনের পর দিন তাঁর নাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আজ ১৯০ টি দেশে তাঁর জামাআত সুপ্রতিষ্ঠিত।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সর্বাধিক প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করা এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরা কেবল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্যই অবধারিত ছিল। আমরা জানি গত ১৫০০ বৎসরের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অগণিত প্রশংসাকারী এবং ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকারী হয়েছেন কিন্তু যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যেভাবে এই কামিল পুরুষ রহমাতুল্লিল আলামীনের সর্বোচ্চ শান ও মুকাম এবং উৎকৃষ্টতম চরিত্র ও গুণাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেছেন এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছেন, এর কোন তুলনাই নেই। তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উচ্চ শান ও মুকাম এবং প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে গেছেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তলে এমন ইশ্‌ক ও মহব্বতমাখা

"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতি যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে তা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, তা পদ্মরাগ মণি নীলকান্ত মণিতে ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্যে তা ছিল না, তা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, তা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে। পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সৈয়্যদুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল আহয়িয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে"

শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছেন যেন তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রসূল করীম (সা.)-এর মর্যাদা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আধ্যাত্মিক জীবন দানের ক্ষেত্রে কিয়ামতসদৃশ নমুনা সকল গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি প্রদর্শন করেছেন যাঁর মুবারক নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত দুনিয়াতে একজনই কামিল ইনসান হয়েছেন সর্বোত্তমভাবে এবং পূর্ণরূপে এক অপূর্ব রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। যুগ-যুগান্তরের মৃতরা এবং সহস্র সহস্র বৎসরের গলিত অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তাঁর আগমনে সমাধিসমূহ নব জীবন লাভ করল এবং তিনি প্রতীয়মান করে দেখালেন, তিনিই হাশির বা সমবেতকারী এবং তিনিই রূহানী কিয়ামত। এক জগৎ কবরসমূহ হতে উঠে তাঁর সমর্থনে দন্ডায়মান হল" (আইনায়ে কামালতে ইসলাম)।

তিনি আরো বলেন, "আঁ হযরত (সা.)-এর চিরস্থায়ী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এটিও, হযরত মাম্‌দূহ্‌র (অর্থাৎ নবী করীম-সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ সদা সর্বদা জারী রয়েছে। এই যুগেও যে-ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণ করে তাকে নিঃসন্দেহে কবর হতে উত্থিত করা হয় এবং তাকে এক নতুন রূহানী জীবন দান করা হয়" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) রসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে আরো বলেন, "স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায় এরূপ নয়, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই এর আলো প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন কিতাব নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতাআলা চিরকাল জীবিত রাখেন নি" (কিশতিয়ে নূহ)।

"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতি যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে তা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায়

তা ছিল না, তা পদ্মরাগ মণি নীলকান্ত মণিতে ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্যে তা ছিল না, তা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, তা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে। পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সৈয়্যদুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল আহয়িয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্র উল্লেখিত হয়েছে তা হযরত মূসা অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সব উত্তম চরিত্রগুণ একত্র হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল।"

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যেরূপে তাঁর আকা ও প্রভুর শান ও মুকাম এবং সৌন্দর্য ও কামালিয়তকে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করেছিলেন তেমন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো কয়েকটি কথা পেশ করছি ঃ তিনি লিখেন "আল্লাহ্ তাআলার পরে মুহাম্মদের প্রেমে আমি বিভোর, তা যদি কুফরী মনে করা হয় তা হলে খোদার কসম! আমি বড় শক্ত কাফির" (ফার্সী দূররে সামীন)।

"ওহে প্রিয়! তোমার মহব্বত আমার অন্তরের অন্তঃস্তলে আমার সব ইন্দ্রীয় এবং আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে" (আরবী দূররে সামীন)।

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হয়েছি–আমি তাঁরই হয়ে গেছি যা কিছু তিনিই, আমি কিছুই নই প্রকৃত মীমাংসা এটাই" (উর্দূ দূররে সামীন)।

"যদি সেই প্রিয়ের গলিতে তলওয়ার চলে তবে আমি প্রথম ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম প্রাণ দান করব" (ফার্সী দূররে সামীন)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেমের দৃষ্টান্ত যদি আমরা এভাবে তুলে ধরতে থাকি তাহলে বিশাল এক কিতাব হয়েও শেষ হবে না। কারণ তিনি যা কিছু বলেছেন সবই সেই মহান নবীর শিক্ষা থেকেই বলেছেন এবং করেছেন। আজ যারা বলে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব রসূল করীম (সা.)-কে বড় মনে করে না এবং মানে না, আমি বলি যারা এ ধরনের কথা বলে তারাই আসলে আমাদের প্রিয় নবীকে মান্য করে না এবং বড় মনে করে না। কারণ তারা ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় বর্তমানে যারা আহমদীয়া জামাআতের বিরোধিতা করছে তারা নিজেরাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বড় ও শেষ নবী হিসেবে মান্য করে কি না তা তাদের ভেবে দেখা উচিত।

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হয়েছি–আমি তাঁরই হয়ে গেছি যা কিছু তিনিই, আমি কিছুই নই প্রকৃত মীমাংসা এটাই"

আজও যে দেশেই ইসলাম ও রসূল করীম (সা.)-এর উপর নোংরা আপত্তি উত্থাপিত হয় তৎক্ষণাত আহমদীয়া জামাআতের পক্ষ থেকে এর সঠিক জবাব দেওয়া হয়। গত ২৮/০৩/০৮ তারিখের জুমুআর খুতবায় এ যুগের ইমাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পঞ্চম খলীফা হল্যান্ডের এক সাংসদের ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকান্ডকে তীব্র নিন্দা জানান এবং তিনি ইসলামের অপার সৌন্দর্য ও রসূল করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ জগতের সামনে তুলে ধরেন।

আহমদীয়া বিরোধীরা আসলে জানে না মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যে ইসলামের জীবন পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন এবং তিনি যে এ যুগের সবচেয়ে বেশি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-কে ভালবেসেছেন এবং তাঁর প্রেমে বিলীন হয়েছিলেন যার ফলেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। বর্তমান কালেও আহমদীরাই প্রকৃত অর্থে রসূল (সা.) ও ইসলামের মাকাম দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে যাচ্ছে। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রতিশ্রুত মাহদীর কর্মময় জীবনের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আজও যারা তাঁর সত্যতা নিয়ে সন্দিহান তাদের জন্য দোয়া করি খোদা তাআলা যেন তাদেরকে সত্য বুঝার ও গ্রহণ করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বয়আত দিবস ২৩ মার্চ

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময় ঃ

পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস্ সামায়ে ইলাল আরযি সুম্মা ইয়ারুযু ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিম্ মিম্মা তাউদ্দুন" অনুবাদ ঃ তিনি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পৃথিবীকে (কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেন। অতঃপর তা তাঁর (আল্লাহর দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।" (সূরা সাজদা ঃ ৬ আয়াত)

এ আয়াত অনুয়ায়ী এক হাজার বছর পরে আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীতে ঈমানকে সঞ্জীবনী প্রদান করার জন্য এক মহাপুরুষ প্রেরণ করবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। এই এক হাজার বছর এর গণনা কাল শুরু হবে নবী করীম (সা.)-এর তিনশত বৎসর পর থেকে। কারণ হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন "খায়রুল কুরুনী কারনী সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মা ইয়াজ্হারুল কিয্বু"। অর্থ ঃ আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, তারপর উহার সন্নিহিতগণ অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে। (নিসাই ও মিশকাত)

আঁ হযরত (সা.)-এর সোনালী যুগ তিনশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর হতে এক হাজার বছর পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার কথা কুরআনের আয়াত সমর্থন করে।

অপর একটি হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশের কথা আরো কিছু পূর্বে শুরু হবে বলা হয়েছে। যেমন আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই লক্ষণ সমূহ ২০০ বৎসর পরে দেখা দিবে, যা হাজার বৎসর পরে আসবে। (মিশকাত)

অর্থাৎ (১০০০+২০০)=১২০০ হিজরী সনের পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আরম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে। (মিশকাত) তেমনি হযরত রসুলে করীম (সা.) আরো বলেছেন, "ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াতের প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে। ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব দেখা দিবে, ভূমিকম্প বেশী হবে, ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে মানুষ গৌরব বোধ করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, জাতীর নীচ প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দুর দেশে যাতায়াত করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথা সময়ে প্রকাশিত ও পূর্ণতা হয়ে চলেছে। আর এসব নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পেতেই থাকবে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর বংশ

কুরআন করীমের সূরা জুমুআর ৪ নং আয়াতে এসেছে, ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম। এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুমুআ ৪ আয়াত)

এ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বুরূযীরূপে অপর এক ব্যক্তি আখেরী যুগে আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হদীসে নবুবীতে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম তখন সূরা জুমুআ যার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহিম' আয়াত আছে অবতীর্ণ হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ্র রসুল! তারা কে (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয়নি)? কিন্তু তিনি তার কোন উত্তর দেননি, এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের (পারশ্য বংশের) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হতে তাকে নামিয়ে আনবেন।" (বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ঈমানকে প্রতিষ্ঠা করবে এই জগতের বুকে।'

ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্মের সম্ভাব্য সময় ঃ

আর কতিপয় হাদীস থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্মের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আবু হুয়ায়ফা (রা.) বর্ণিত রসুলূল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন ১২৪০ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন আল্লাহ্ তাআলা ইমাম মাহ্দীকে পাঠাবেন। (আল নাজমুস সাকেব ২য় খন্ড)

এই হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বার্তা ১২৪০ হিজরী সনের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আল্লামা শা'রানী তাঁর প্রণীত 'আল ইওয়াকীতু ওয়াল জাওয়াহির' পুস্তকে লিখেছেন ঃ ইমাম মাহদী (আ.) ১২৫০ সনের সাবান মাসের ১৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন। এখানে জন্মের সন তারিখ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মাহদীর দাবীর সম্ভাব্য তারিখ ঃ

তেমনি ফসুসুল হিকাম গ্রন্থে হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (রহ.) লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হিজরী ১২৯১ সনে সংঘটিত হবে।" এভাবে অসংখ্য বর্ণনা থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্ম এবং আবির্ভাবকাল সম্পর্কে জানা যায়।

আল্লামা আবুল খাইর নূরুল হাসান খাঁন ১৩০১ হিজরী সনে তাঁর গ্রন্থে ২২১ পৃষ্ঠায় লিখেন.....হয়ত আল্লাহ্ তাআলা আপন ফজল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষন করবেন আর চার/ছয় বছরের মধ্যেই মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়ে যাবেন। (ইকতাবাতুস্ সায়া ২২১ পৃ.) অর্থাৎ (১৩০১+৬)=১৩০৭ সন (হিজরী) এর কথা বলা হয়েছে যখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে এই পৃথিবীতে পাঠালেন ১২৫০ হিজরী সনের ১৪ই শাওয়াল শুক্রবার মোতাবেক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। তাঁর সাথে এক জময বোন (জান্নাত) জন্ম নিলেন যেভাবে হাদীসে উল্লেখ ছিল হযরত ইমাম মাহদী জময জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি (আ.) ১২৯১ হিজরী সনে প্রত্যাদিষ্টরূপে ইলহাম প্রাপ্ত হন যখন তাঁর বয়স ৪০ অতিক্রম হয়েছে। তারপরে ১৩০৬ হিজরী সনে মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো। এ যুগে

ফসুসুল হিকাম গ্রন্থে হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (রহ.) লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হিজরী ১২৯১ সনে সংঘটিত হবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

১২৯১ হিজরী সন মোতাবেক ১৮৮২ সনের ২৬ মার্চ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার যে ইলহাম লাভ করেন তাহলো, "**কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন।**" অর্থাৎ তুমি বল আমি আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম। (বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড)

মোজাদ্দেদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৫ সনে একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী প্রকাশ করে দিলেন ব্যাপক ভাবে। উর্দু এবং ইংরেজিতে ২০ হাজার কপি করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় সমস্ত বড় বড় ধর্মীয় নেতা যুগে এমন কোন প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি বাকী ছিল না যে যাকে এই সংবাদ পৌঁছানো হয়নি।

বিজ্ঞাপন প্রকাশ হলে ভক্তদের অনেকেই হুযূর (আই.)-এর কাছে বয়আত নেওয়ার জন্য পীড়া-পীড়ি করতে থাকেন। তাদের অনুরোধে তিনি (আ.) বলেন, "আমার সমুদয় কর্মতৎপরতা মহান আল্লাহ্ তাআলার ইখতিয়ারভুক্ত। অতএব তাঁর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতে পারি না।"

১৮৮৫ সনের শেষ দিকে ও ১৮৮৬ সনের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলার আদেশে হুশিয়ার পুর ৪০ দিনের ইবাদত বন্দেগী করেন এবং যার ফলশ্রুতিতে ইলহামসমূহ লাভ করেন আর ঐ সময় সেই বিখ্যাত আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও লাভ করেন। ইলহামের কথাগুলি ১৮৮৬ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়।

বয়আত নেওয়ার কথা ঘোষণা ঃ

এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ জুন ১৮৮৮ সনে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে বয়আত নেওয়ার ইলহাম প্রাপ্ত হন। এর কিছুদিন পার ১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ সবুজ ইশতেহার প্রচার পত্রটির সাথে 'তবীলগ' শিরোনাম দিয়ে একটি টীকা সংযোজন করেন এতে জনসাধারণকে তাঁর হস্তে বয়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। এই প্রচার পত্রে তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করলেন, যারা সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী তাদেরকে দীক্ষা দানের জন্য তিনি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন, যারা প্রকৃতই নোংরা, অলসতা, অপবিত্র জীবন পরিহার করতে আগ্রহী তাদের উচিত অবিলম্বে তাঁর হাতে বয়আত করে সততা, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা মজবুতি

আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জনসাধারণকে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি তাদের বোঝা লাঘবে আন্তরিক সহযোগিতা দান করবেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন তবে শর্ত হলো তারা যেন সর্বান্তকরণে ঐশী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ মেনে জীবন অতিবাহিত করেন। (সবুজ ইশতেহার টীকা তবলীগ ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮)

বয়আতের দশশর্ত প্রকাশ ঃ

এ বছরের শেষে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী 'ইশতেহার তকমীলে তবলীগ নামে বয়আতের (১০)টি শর্ত সম্বলিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। সেই ১০ টি শর্ত মেনেই আজও জামাআতে আহমদীয়ার বয়আত করতে হয়, শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১)বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হতে পবিত্র থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, উহার শিকারে পরিণত হবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রর্থানা করবে ও ইস্তেগফার পড়বে, ভক্তিপুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করবে।

(৪) উত্তেজনার বসে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত থাকবো এবং সকল অবস্থায় তাঁর মীমাংসা মেনে নিব।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

> তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদের প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের উপর বিজয় দান করবেন। সর্বদা কিয়ামত কাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

(৭) অহংকার ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার. ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) আল্লাহ্ তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(ইশতিহার তকমীলে তবলীগ ঃ ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ ইং

লুধিয়ানায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান ঃ

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এটাও নির্দেশনা ছিল যে, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারা সম্পন্ন করার পর যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বয়আতের জন্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আগে দোয়া করুন, ইস্তেখারা করুন অতঃপর বয়আত করুন। উপরোক্ত প্রচারপত্র পেশ করার পর হযরত আকদাস (আ.) কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানায় গমন করেন ও 'মহল্লা জাদীদ'-এ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.)-এর গৃহে অবস্থান নেন। (হায়াতে আহমদ, তৃতীয় খন্ড, প্রথম অংশ পৃষ্ঠা-১)

বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

তিনি (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেই বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি আলোকপাত করে ৪ মার্চ ১৮৮৯ইং এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, তিনি লিখেন ঃ 'বয়আতের এই সিলসিলাহ্ বিশেষ ভাবে খোদা ভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের জামাআতকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, যাতে খোদাভীরুতায় এমন এক বড় দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের নেক প্রভাবের বিস্তার ঘটায় এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠত্ব

প্রকাশকারী শুভ পরিণামের কারণ হয়। এই কল্যাণমন্ডিত একত্ব প্রকাশক বাক্যের উপর সমবেত হওয়াটা, ইসলামের পাক পবিত্র ও সম্মান পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সেবায় দ্রুত সফলতা আনতে পারে, যাতে এক মুসলমানকে পীড়িত, নিষ্পেষিত, কৃপণ পরাভূত ও পর্যদুস্ত মুসলমানে পরিণত হতে না হয়। এরা সে রকম অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতো বিরোধিতা ও অনৈক্যের কারণে ইসলামের বড় ক্ষতি করেছে। এর আনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কলঙ্কের কালিমাপূর্ণ দাগ এঁকে দিয়েছে। আবার এমন অকর্মণ্য সাধু সন্ন্যাসী বা নির্জনবাসী ঘরকুনোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ আপনজনদের প্রতি সহমর্মিতার কোন বালাই নেই আর যাদের মানব সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্প্রিহাও নেই। পক্ষান্তরে এরা অর্থাৎ বয়আতকারীরা হলো এমন জাতি, যারা গরীবের আশ্রয়স্থল, এতিমদের জন্য বাপের মতো ও ইসলামের কাজে সহায়তা দিতে একান্ত প্রেমিকের মতো আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনা এ উদ্দেশ্য করে যেন এর সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করে। আর ঐশী প্রেমে ও খোদা তাআলার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবন ধারা প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে এক স্থানে মিলে গিয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়।.....খোদা তাআলাই এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে স্বীয় শক্তি ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শন করতে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর এদেরকে উন্নতি দান করতে চাচ্ছেন যাতে পৃথিবীতে মহব্বতে ইলাহী (পরম উপাস্যের প্রতি ভালবাসা), তওবা নূসুহ (আন্তরিক অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে প্রত্যাবর্তন), পবিত্রতা প্রকৃত ও সঠিক পুন্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানব সন্তানের জন্য মায়া মমতা সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়া যায়। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে, তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ বাণী দ্বারা শক্তিও ক্ষমতা যোগাবেন, তাদের নোংরামী পূর্ণ জীবন ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দান করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবেশ করাবেন। তারা ঐ প্রদীপের মতো যা ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা অনুকণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিনি এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদের প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের উপর বিজয় দান করবেন। সর্বদা কিয়ামত কাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। ঐ 'রাব্বে জলিল'-ই এটা চেয়েছেন, সর্বশক্তিমান, যা-ই তিনি চান করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তিও মহিমা তাঁরই। (তবলীগে রিসালত, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা১৫০-১৫৫)

প্রথম বয়াত অনুষ্ঠান ঃ

ঐ একই ইশতিহার বা বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বয়আত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় উপস্থিত হবেন। পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'মহল্লা জাদীদ'-এ অবস্থিত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে প্রথম বয়আত নেন। এ বয়আত অনুষ্ঠানে হুযূর (আ.) বয়আত নেওয়ার জন্য একটি কক্ষে একেকজনকে আলাদা আলাদা ভাবে ডাকতেন ও বয়আত নিতেন। এভাবে প্রথম বয়আত করেন হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন (রা.) এর। সেদিন ৪০ (চল্লিশ) জন পূণ্যাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হস্তে বয়আত গ্রহণ করেন।

সেদিনের বয়আত গ্রহণকারীরা হলেন, হযরত মাওলানা হেকীম নূর উদ্দীন (রা.) হযরত হাফেজ হামেদ আলী (রা.), হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারী (রা.), প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

মার্চ মাস পর্যন্ত হুযূর আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেন।

২৩ মার্চ ১৮৮৯ জামাআতের সূচনা কালে ঃ

এই ২৩ মার্চ ১৮৮৯ইং এর বয়আত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের গোড়াপত্তন হয়। যা আজ শত শত বছর পরে সারা বিশ্বে প্রায় ১৯০টি দেশে আহমদীয়াতের বিস্তৃতি লাভ করেছে। ২০ (বিশ) কোটির উর্ধে আহমদীয়া সদস্য সংখ্যা হয়েছে। সকলের কাছেই এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপযপূর্ণ। তাই আমাদের এই দিবসকে স্মরণীয়-বরণীয় করার জন্য নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে আমাদের খাঁটি মানুষ হিসেবে সর্বদা নেক আমলের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমলের ময়দানে আগে বাড়ার তৌফীক দিন আর প্রত্যেকের বয়আত কবুল করুন, আমীন।

এনামুল হক রনী
ওয়াকেফে যিন্দেগী

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নতুন কেউ নন। তাঁর আগমনের কথা দেড় হাজার বৎসর পূর্বেই হযরত নবী করীম (সা.) বলে গেছেন। অতএব, তাকে মানার অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐশী আদেশকে মান্য করা। এক কথায় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশকে মান্য করা।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি বাংলা বই বাজারে বের হয়েছে। তাতে নবী করীম (সা.)-এর অনুগত ও আশীসমন্ডিত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন আলেম ওলামাদের সুচিন্তিত মতামত গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে। বরেণ্যে আলেম ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন তা নিচের কয়েকটি অভিমত ও উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়। এ সম্পর্কে অধিক ব্যাখ্যার আর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ইমাম মাহদী (আ.) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি হিসাবে গৌরবোজ্জল সম্মান ও পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। কাজেই যথাসময়ে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)কে গ্রহণ বরণ করে নেওয়া উচিত।

ইমাম মাহদী সম্বন্ধে কয়েকজন আলেম-ওলামার লেখায় বর্ণিত অভিমত উদ্ধৃত করা হলো–

* মাওলানা খন্দকার বশির উদ্দিন লিখেছেন, "হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা,)-এর সহিত হুবহু মিলে যাবেন। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও কথা-বার্তা হবে অবিকল রসূলুল্লাহ্ (সা,)-এর মতই" ('হযরত ইমাম মাহদী আ. ২, ৪ পৃঃ দ্রঃ)।

* হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এতে মনে হয় যেন দেড় হাজার বছর আগেকার অন্তর্হিত সেই রসূলই আবার নতুন রূপ ধরে পৃথিবীতে আসছেন।" (কানা দাজ্জালের আগে ও পরে, ৮ম পৃঃ)। বস্তুতঃ হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হবেন মহা নবীর (সা.)-এর বুরুজ বা আত্মিক বিকাশ। এথেকে ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ইমাম মাহদী (আ.) বিশ্ব মুসলিম জাহানের প্রিয় নেতা হবেন। তাকে মান্য করার মধ্য দিয়ে

ইমাম মাহদী (আ.) বিশ্ব মুসলিম জাহানের প্রিয় নেতা হবেন। তাকে মান্য করার মধ্য দিয়ে মু'মিন মুত্তাকীগণ সঠিক পথের সন্ধান পাবে। ফিরকাবাজি ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে সত্যাশ্রয়ীরা একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জামাআতবদ্ধ হয়ে চলবে। ইমাম মাহদীকে মানার বিষয়টি সমগ্র মুসলমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মু'মিন মুত্তাকীগণ সঠিক পথের সন্ধান পাবে। ফিরকাবাজি ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে সত্যাশ্রয়ীরা একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জামাআতবদ্ধ হয়ে চলবে। ইমাম মাহদীকে মানার বিষয়টি সমগ্র মুসলমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

* ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণ এই যে, তাঁর আগমনের সময় হচ্ছে পুচ্ছ-বিশিষ্ট নক্ষত্র (ধূমকেতু) উদিত হবে এবং বার বার উদিত হবে। (হুজাজুল কেরামা পৃ ৩৪৫)।

* হযরত ইমাম মুহিউদ্দিন আরাবি (রাহে.) তাঁর রচিত 'ফসুসুল হিকাম' পুস্তকে ইমাম মাহদীর জন্ম সম্বন্ধে লিখেছেন, "শেষ যুগে এই প্রকারের এক মহাপুরুষ (ইমাম মাহদী (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি শ্রেষ্ঠতম সন্তান এবং বহু রহস্য ও সুক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানের বাহক হবেন। তিনি এক ভগ্নীসহ যমজ জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর পূর্বে ভগ্নী ভূমিষ্ট হবে এবং পরে তিনি ভূমিষ্ট হবেন।" (ফসুসুল হিকাম ঃ ৬৭ পৃঃ, ১ম খন্ড, বৈরুতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, অনুবাদ মাওলানা ফাযেল মুহাম্মদ মুবারক আলী ১৩০৮ হিঃ)।

* "ইমাম মাহদীর আগমন বা চরিত্র ও প্রিয় নবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মহান আখলাকের অনুরূপই হবে, ইমাম মাহদী হবেন বাহ্যিক ও আন্তরিক দিক থেকে প্রিয় নবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসারী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয় দিক থেকে আল্লাহ্ পাক ইমাম মাহদীকে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অনুসারী করবেন। শুধু চেহারা ছবিতে, চাল চলনে, আচার ব্যবহারে, দেখা শুনাই নয় বরং নামের ব্যাপারেও তাঁর সদৃশ্য হবে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর সাথে।" (মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম কৃত 'ইমাম মাহদীর (আ.) আগমনের পূর্বেও পরে গ্রন্থ দ্রঃ)।

* রহমানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'ইমাম মাহদী' (আ.) পুস্তকে বলা হয়েছে, "ইমাম মাহদী উপাধি ধারণ করে যে মহান বুযুর্গ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন তিনি রসূলে করীম (সা.)এরই প্রতিরূপ (ঐ, ২ পৃঃ)।" বলা হয়েছে,

"তাঁর নাম যদিও আহমদ হবে কিন্তু জন সাধারণ তাকে ইমাম মাহদী নামেই আখ্যায়িত করবে" (ঐ, ৩ পৃঃ)। লেখক লিখেছেন। নবুওয়তের যুগে পৃথিবীর যে বিশেষ সংকটময় অবস্থায় নবী রসূলগণ আগমন করতেন, বর্তমান বিশ্ব তার চাইতেও বেশী সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন (ঐ, পৃঃ ১৫)।

* ইসলামিক ফাউন্ডেশন হিজরী ১৪০০ হিজরী বার্ষিকী উপলক্ষে মাওলানা বদিউল আলমের 'ইমাম মহদী (আ.) ও কিয়ামতের নিদর্শন' নামক একটি বই প্রকাশ করেছে। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন, আমার আওলাদের শ্রেষ্ঠ ইমাম মাহদী (আ.) অন্যায় যুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।.... কেবলমাত্র খাঁটি ঈমানদারগণই ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরিচয় লাভ করবে এবং তার সঙ্গী হবেন ও সমর্থন দিবেন। দুর্বল ও নামধারী মুসলমানগণ ইমাম মাহদী (আ.)-কে সমর্থন করবে না এবং তারা ইমাম মাহদী (আ.)-এর ন্যায় নীতিকে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই তারা দাজ্জালের ধোকায় পড়ে যাবে। কারণ ইমাম মাহদীকে প্রথম দিক দিয়ে কঠোর সংগ্রমে অবতীর্ণ হতে হবে। তার সাথে যারা থাকবে তাদেরকেও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। তাই দুর্বল ঈমানদারগণের সে পরীক্ষায় টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। যে সব মুসলমান বিজাতীয় ভাবধারা ও চাল চলন অবলম্বন করাকে গৌরব বলে মনে করে থাকে তারাই বেশীর ভাগ ইমাম মাহদী (আ.) ও তার দলের বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (ঐ, খ ও গ পৃ)।

কেবলমাত্র খাঁটি ঈমানদারগণই ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরিচয় লাভ করবে এবং তার সঙ্গী হবেন ও সমর্থন দিবেন। দুর্বল ও নামধারী মুসলমানগণ ইমাম মাহদী (আ.)-কে সমর্থন করবে না এবং তারা ইমাম মাহদী (আ.)-এর ন্যায়-নীতিকে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই তারা দাজ্জালের ধোকায় পড়ে যাবে।

* জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী লিখেছেন, "আমার আশঙ্কা হয় তাঁর নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলবী ও সূফী সাহেবরাই আগে চিৎকার শুরু করবেন। উপরন্তু আমার মতে সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হবে না এবং নিশানী দেখে তাঁকে চিহ্নিত করাও যাবে না। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ২৫ পৃঃ)। মওদুদী সাহেব মনে করেন "তিনি নির্ভেজাল ইসলামের ভিত্তিতে একটি নতুন চিন্তা জগত গড়ে তুলবেন। মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার পরিবর্তন করবেন" (ঐ, ২৬ পৃঃ)।

* হযরত ইমাম মাহদী (আ,) নামে একটি পুস্তকে মাওলানা ফজলুর রহমান এম, এম, (ফাষ্ট ক্লাস) এম-এ একটি হাদীসের উল্লেখ করে লিখেছেন, "ইমাম মাহদী (আ.) শাওয়াল মাসে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার পূর্ববর্তী রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে (পৃঃ ৬০, ১৯৮, প্রথম সংস্করণ)।

* 'কানা দাজ্জালের আগে ও পরে' পুস্তকে আছে, "হাল জামানার কোন অলি আল্লাহ্ ইতিমধ্যে মন্তব্যও করেছেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) যথারীতি পৃথিবীতে এসে গেছেন। শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ কাশ্মিরি (রা.)-এর প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণীতেও একথার সমর্থন পাওয়া যায় (৬পৃঃ ১৯৮২ইং) এই পুস্তকে আরো বলা হয়েছে, "ইমাম মাহদী (আ.) জন্মলাভ করেছেন" (ঐ ১০ পৃঃ)। উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে, "ইমাম মাহদীর প্রথম যুদ্ধ হবে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে। কারণ ইসলাম ও মুসলমানদের খতম করার জন্য এই শক্তিটি বরাবরই কাজ করে আসছে (ঐ, ২১ পৃঃ)। এই সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, এই খ্রীষ্টানী প্রচারণাই দাজ্জালী প্রচারণা। কেননা 'খোদার পুত্র আছে' এহেন ডাহা মিথ্যা আর হতে পারে না। (সম্প্রতিককালে মুসলমানদের অবক্ষয় এবং ইমাম মাহদী (আ,)-এর প্রত্যাশা পৃঃ ১৬, ১৭)।

অধঃপতিত খ্রীষ্টানদের কার্যকলাপ, মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় চরম অধঃপতন এবং পতন যুগের লক্ষণাবলী দর্শন করে মাসিক 'নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকা লিখেছে, "এ যুগ হযরত মাহদী (আ.)-এর যুগ। আপনারা শেষ ডাকের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন" (সেপ্টেম্বর ১৯৮০, ২৪ পৃঃ)। কিন্তু হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে কি এত সহজেই লোকেরা সাদরে গ্রহণ বরণ করে নিবে?

মাওলানা মওদুদী খোদা তাআলার প্রেরিত মহামানব এবং নবী-রসূলদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মোট কথা প্রত্যেক নবীর দাওয়াত শুনে সেই যুগের লোকেরা শুধু এই কথাই বলেছে ঃ তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।" (মুসলমান কাহাকে বলে পুস্তিকা, পৃঃ ১৫)।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর জামাতের বিরোধিতা সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম মাহদীর (আ.) বিরুদ্ধাচরণ হবেই, তাঁর জামাআতের বিরুদ্ধে অত্যাচার হবেই। এই অত্যাচার যেমন মৌলবীদের পক্ষ থেকে হবে তেমনি হবে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষ থেকেও; ইমাম মাহদীর (আ.) বক্তব্য বা লেখাকে বিকৃত করে জনগণকে ধোকা দেওয়া হবে, আলেমরা তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করবেন

এমনকি ইমাম মাহদীকে (আ.) গালি-গালায করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করবে না। কেননা এটাই চিরকাল হয়ে আসছে। সকল নবীরই বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। এটাতো নবী রসূলদের সুন্নত। ('সম্প্রতিকালে মুসলমানদের অবক্ষয় এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রত্যাশা' পৃঃ ১৯ লেখক আহমদ তৌফিক চৌধুরী)।

কাজেই অপশক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্য ইমাম মাহদী ও সত্য মসীহর দাবীর বিষয়টি দোয়ার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা উচিত। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশক্রমে হযরত ইমাম মাহদী (আ)কে সদরে গ্রহণ বরণ করে নিয়ে ঐ জামাআতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে চলা প্রয়োজন। অন্যথায় ঐশী শাস্তি থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। যামানার ইমামকে যারা মেনে নিবে তারা ঐশী আযাব গযব এবং ভয়ংকর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এখন এই যুগে ইমাম মাহদীর কোনো দাবীকারক রয়েছে কিনা এবং কুরআন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকল্পে যথাসময় কেউ আবির্ভূত হয়েছে কিনা তা তলিয়ে দেখা দরকার। কারণ সত্য দাবীকারককে মেনে নেওয়া ছাড়া কারো গত্যান্তর নেই। আসুন প্রকৃত ইমাম মাহদীর দাবীকারকের দাবী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর এতেই মুসলমানদের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত। বর্তমান যামানায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছাড়া অন্য কেউ ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে ১৪ হিজরী শতাব্দীতে যামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছেন বলে কারো জানা নেই। কাজেই আর কাল বিলম্ব না করে সত্য মাহদী ও মসীহকে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

আমীর মাহমুদ ভূইয়া

কবিতা–

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ

গোলাম আহমদ (আ.) যুগের মাহদী,
এসেছেন ভবে শুনো।
কাদিয়ান ভূমে জন্ম তাঁহার,
তোমরা কি তারে চেনো?
মাতৃকুলে সৈয়দ তিনি–
পিতৃকুলে পার্শিয়ান।
ধর্ম গ্রন্থ খুললেই পাবে,
সত্য সঠিক প্রমাণ।
জময বোনের সংগে তাঁর,
জন্ম শুক্রবারে।
নদীর পারের গ্রাম সে টি,
হাদীস প্রমাণ করে।
খোদার সেই বীর, কেতাব রচিয়া,
ইসলাম দ্বীনের তরে।
প্রচার করেন মানুষের মাঝে,
সকলের ঘরে ঘরে।
পন্ডিত আর পুরোহিত গণে,
সকলে তারা মিলে–
ইসলামকে ধ্বংস করতে চাহে,
লোক নিয়োগ করে।
কিন্তু খোদা মাহদীকে এনে,
ইসলাম রক্ষার তরে–
ক্ষুরধার এক লেখনী আনিয়া
দিলেন তাঁর করে।
জুলফিকার সম লেখনী তাঁর,
যুক্তির আলোক হানি।
ধ্বংস করে দিলেন আঁধার,
আমরা সকলে জানি।
বিশ্বের বুকে শিষ্যেরা তাঁর,
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে–
শান্তির বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে
দিতেছে সকলের হৃদয় জুড়িয়ে।

শাহ হকিব উদ্দিন
সৈয়দপুর

প্রশংসা

হে মহান প্রভু মম! সাজিয়েছ তুমি এ
পৃথিবীটা কত সুন্দর করে
যার খানিকটা দেখেই হৃদয় আমার
তৃপ্তিতে যায় ভরে।

জন্মের পূর্বেই আগুন পানি মাটি বাতাস
রেখেছ তৈরী করে
যার একটির অভাব হলেই যাব আমি মরে।

খুঁটি ছাড়া এ আকাশটাকে রেখেছ করে খাড়া
যার বুকে ধারণ করে আছে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা।

সবই চলছে এক নিয়মে, থামছে না
তোমার নির্দেশ ছাড়া
যা ভেবে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি,
হয়ে যাই আত্মহারা।

জমিনকে করেছ সমতল
আর পাহাড় করেছ উঁচু
এরই ভিতর রেখেছ অসংখ্য নদ-নদী,
সমুদ্রও কিছু কিছু।

হরেক রকম গাছপালা দিয়ে সাজিয়েছ তব ভূমি
আবার কোথাও বরফে ঢেকেছ
কোথাও বা মরুভূমি।

কত স্বাদের ফলফলাদি আর কত যে রঙের ফুল
তারই সাথে মিশে আছে যত সুগন্ধের ঝোল।

কত প্রজাতির জীবজন্তু আর হরেক রঙের পাখি
মাছের গায়ের আলপনা
দেখে দেখে অবাক চেয়ে থাকি।

জ্বিন ও ইনসান বানিয়েছ তুমি সৃষ্টির সেরা করে
সর্বদা যেন চলে তারা বুদ্ধিবিবেক করে।

না চাইতেই তুমি শিক্ষক দিয়েছ
নবী রসূলদেরে
সঠিক পথে চলতে যেন ভুল নাহি করে।

দুঃখ হল-দুনিয়ার তরে চলে মানুষ
হিসাব নিকাশ করে
দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে দিশেহারা হয়ে ঘুরে।

কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা বেঠিক বুঝতে নাহি পারে
এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে
কাফির বলে ফিরে।

অবশেষে এক শিক্ষক পাঠালে ইমাম মাহদী করে
যিনি এসে ঘোষণা দিলেন
মহানবীর গোলাম বলে।

মোহাম্মদ আজিজুল হক

স্বর্গ সুখ বনাম নরক যন্ত্রণা

বর্তমান সংঘাতময় ও সমস্যা সংকুল পৃথিবীতে 'স্বর্গসুখ' শব্দটি মনে হয় একেবারেই বেমানান। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে এ কথা সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ এবং তাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা তাঁর অনুগত বান্দা। তারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসেন, তাঁর অনুশাসন মেনে চলেন এবং নবী করীম (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদেরকে পরিচালিত করেন। তাঁরাই পৃথিবীতে স্বর্গসুখ লাভ করেন। তাঁদের উপরে সদা আল্লাহ্র রহমত ও বরকতের বারিধারা বর্ষিত হয়। সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, অনিষ্ট ও পাপাচার থেকে তারা মুক্ত থাকেন। তাদের হৃদয় সর্বদা আল্লাহ্র হাম্দ ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে এবং সকল অবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেন। তাই এই পৃথিবী তাঁদের কাছে স্বর্গতুল্য। জগতে তারা যেমন স্বর্গসুখ ভোগ করেন, পরকালেও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জান্নাতের অনন্ত সুখ ভোগের ব্যবস্থা।

অপরদিকে যারা আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্য বান্দা, শয়তানের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়েছে এবং দুনিয়াবী লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে নানা অন্যায়, অনাচারে লিপ্ত তারা খোদা তাআলার সকল আশীষ থেকে বঞ্চিত, এরাই জাহান্নামী ও পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীব। এরা নিজেরা যেমন শান্তি পায় না, অন্যের শান্তিতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এ জগতে তারাই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, পরকালেও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

'সুখ' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে উপলব্ধি বা চিন্তাধারা তা হলো আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করা। সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে যে কোন উপায়ে নিজের অবস্থানকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরের ক্ষতি সাধন করা, ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–'এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তারা, যারা ভুপৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা (কোন বিবাদ না করে) বলে, 'সালাম'। (সূরা আলফুরকান, আয়াত ঃ ৬৪)

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানব ও অন্যান্য সৃষ্টির সাথে শান্তিতে বসবাস করার নির্দেশ দেয়। রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, 'যার হস্ত ও মুখ হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে,সেই মুসলমান।' শান্তির বিপরীতে অশান্তি বা বিবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। তাই তিনি (সা.) এ সম্পর্কে আরো বলেছেন, 'যে অশান্তি বা বিবাদ সৃষ্টি করে সে বেহেশতে যাবে না'।

> রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, 'যার হস্ত ও মুখ হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে,সে-ই মুসলমান।'

রসূলে পাক (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর জাতি তমশাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে থেকে সকল নীতি বহির্ভূত অভ্যাস ও কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি (সা.) এসে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংগঠনের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আল্লাহ্ তাআলার ন্যায় পরয়াণ দাসে পরিণত করেন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘঠান যা ছিল পূর্ববর্তী অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের শান্তির পরশপাথরের গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। শান্তিকামী মানুষকে শান্তিসুধা পান করিয়েছেন, নিজেরাও পেয়েছেন শান্তি ও সুখের পরশ। অপর দিকে অশান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী যারা তারা ইসলামের শান্তির পরশকে কখনো উপলব্ধী করতে পারে না। শয়তানের প্ররোচনায়, অহংকার ও বিদ্বেষের কারণে শান্তির পরিবর্তে সর্বদা অশান্তি, অনাচার, অনাসৃষ্টি ও ফ্যাসাদে ব্যাপৃত থাকে। শান্তির পরশ তারা স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তারা নিজেদের চারপাশে এমন এক বাঁধার (অনিচ্ছা, অবাধ্যতার) বেষ্টনী বা দেয়াল সৃষ্টি করে রাখে যে কারণে শান্তি সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে। তাই তারা অশান্তি ও অনাচারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এ ভাবে তারা নিজেরা সুখ পায়না, অন্যের সুখেও বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন. মনের দিক থেকে যে ধনী, প্রকৃত অর্থে ধনী। তেমনি ভাবে বলা যায়, মনের দিক থেকে যে সুখী, সে-ই প্রকৃত অর্থে সুখী। সুখী হওয়া বা প্রাপ্তির চাবিকাঠি মানুষের নিজের কাছেই বিদ্যমান থাকে। ইচ্ছা করলেই মানুষ সুখী হতে পারে যদি তার মধ্যে সন্তুষ্টি ও সহনশীলতা থাকে। পাহাড় সমান ধনসম্পদ বা অধিক প্রাচুর্য কখনো মানুষকে সুখী করতে পারে না। 'সুখানুভূতি' নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে

হয় চেষ্টা ও আমল দ্বারা। অর্থের বিনিময়ে, জোর করে বা বল প্রয়োগে তা আদায় করা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ মতে চলে, তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে, লোভ-লালসা বর্জন করে এবং না পাওয়ার আক্ষেপকে পদদলিত করে, তবেই সে মনের দিক থেকে ধনী ও সুখী হতে পারবে।

আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিজগতে পশু-পাখির মধ্যেও সুখের পরশ বিরাজমান। সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই তা উপলব্ধি করা যায়, গাভীর বাচ্চা যখন গাভীর দুধ খেতে থাকে তখন গাভীটি জিহ্বা দিয়ে গা চেটে আদর ও সোহাগ করতে থাকে। বাচ্চাটি আদর পেয়ে পুলকিত হয়ে এবং লেজ নেড়ে নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তৃপ্তিসহকারে দুধ খেয়ে থাকে। বাচ্চাকে দুধ ৩খাওয়াতে পেরে বাচ্চার প্রতি গাভীটির স্নেহ মমতার অনুভূতি, আত্মতৃপ্তির ভাব ও সুখানুভূতির প্রকাশ এ ভাবে ঘটেছে। পাখির দিকে খেয়াল করলেও এরূপ সুখানুভূতির প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। যেমন কাক অনেক সময় সাথী কাককে ঠোঁট দিয়ে আদর করে, গা পরিষ্কার করে দেয়। কপোত কপোতী গলায় গলায় মিলিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে একে অপরকে ভালবেসে আদর করে। মোরগ-মুরগীর মধ্যেও একই ভাবে ভালবাসার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। তা ছাড়া পাখিরা ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর ছানাগুলো বড় না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দুর দুরান্ত থেকে সেগুলোর জন্য খাবার যোগার করে এনে খাওয়ায়। এভাবে পাখিদের মধ্যে ভালবাসা ও মমতার প্রকাশ ঘটে। এটাই ওদের সখানুভবের প্রকাশ, এতে শান্তির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ তাদের না আছে কোন লোভ লালসা এবং না কোন পাওয়ার বেদনা।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এসব কর্মকান্ডকে বলেন,–'এটা হলো ওদের সহজাত প্রবৃত্তি,' ইংরেজীতে যাকে বলা হয় `Instruct' যা প্রাকৃতিক নিয়মে সংগঠিত হয়। একথা মোটেও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা হলেন আল্লাহ্ তাআলা। তাঁর ইশারায় সব কিছু পরিচালিত হয়, সবকিছু তারই এখতিয়ারভুক্ত। তা জীব জগৎ ও প্রকৃতিতে কোন কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় না। তাছাড়া জীবজন্তু আর পশুপাখির ওরা আল্লাহ্ তাআলা নিয়ম নীতি ভঙ্গ না করে নিজেদের নির্ধারিত পথে চলে। অথচ সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম নীতিকে বিসর্জন দিয়ে সবকিছু ওলট পালট করে চলেছে। এথেকে মনে হয় মানুষ শান্তি চায় না, চায় অশান্তি ও দ্বন্দ্ব কলহ। ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত মানুষেরা বিশ্বশান্তিকে দলিত মথিত করে করেছে পদদলিত। তাই কেউ কেউ মন্তব্য করেন, শান্তি নাকি অভিমান করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। পারমানবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষ আজ মত্ত ও উল্লাসিত। এ অবস্থায় শান্তির প্রত্যাশা করার অর্থ 'আকাশ কুসুম কল্পনা' ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা তাই যথার্তই বলেছেন,–'এবং মানুষ অকল্যাণকে এরূপে আহ্বান করে, যেরূপে কল্যাণকে আহ্বান করা উচিত।" (বনি ইসরাঈল, আয়াত-১২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বার বার তাঁর প্রিয় ও অনুগত বান্দাদের পুরস্কার হিসাবে 'জান্নাত' এবং অবাধ্য ও বিপথগামীদের জন্য শাস্তি হিসাবে 'দোযখ' প্রদানের কথা বলেছেন। এ জান্নাত এবং জাহান্নাম কেবল মহাপ্রলয় সংঘঠিত হওয়ার পরই প্রদান করা হবে তা নয়। বরং নেক বান্দাদের আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ প্রদান করেন আর পাপীরা ভোগ করে নরক যন্ত্রণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ,–একজন অসুস্থ ধনী ব্যক্তি কখনো মুখরোচক, সুস্বাদু ও দামী খাবার পেয়েও তা খেতে পারে না এবং সুরম্য অট্টলিকায় বসবাস করে আরামদায়ক বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে পারে না। কারণ অসুস্থতার জন্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সারারাত সে ছটফট করে রাত কাটায়। এভাবে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। অপরদিকে একজন সুস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তি অতি সাধারণ খাবার তৃপ্তি সহকারে খেয়ে গাছ তলায় বালিশের পরিবর্তে ইট মাথায় দিয়ে আরামে সুখ নিদ্রা যায়। এভাবে সে স্বর্গসুখ লাভ করে। একই ভাবে ঈমান ও আমলের দিক থেকে যারা অসুস্থ অর্থাৎ দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত তারাই নরক যন্ত্রণা ভোগকারী আর এর বিবপরীতে ঈমানের বলে বলীয়ান, নেক ও মুত্তাকী যারা তারা হলেন স্বর্গসুখ ভোগকারী।

ঈমান ও আমলের দিক থেকে যারা অসুস্থ অর্থাৎ দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত তারাই নরক যন্ত্রণা ভোগকারী আর এর বিবপরীতে ঈমানের বলে বলীয়ান, নেক ও মুত্তাকী যারা তারা হলেন স্বর্গসুখ ভোগকারী।

পৃথিবীতে মানুষ অর্থসম্পদের লালসায় ন্যায় অন্যায়ের কথা চিন্তা করে না। সারা জীবন কষ্ট করে অন্যায় পথে যে অর্থ সঞ্চয় করে পরে দেখা যায় সে অর্থই অনর্থ বয়ে আনে। তাই কথায় বলে, 'অর্থ অনর্থের মূল'–এরূপ ঘটনাই আজ

কাল সমাজে অহরহ ঘটছে। যেমন অর্থলোভী ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার অনুশাসন না মেনে অন্যায় ও অসাদুপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে অঢেল ধন সম্পদ সঞ্চয় করে। এভাবে উপার্জিত অর্থে লালিত পালিত তার সন্তানরা মানুষ না হয়ে হয় অমানুষ। কারণ এ উপার্জনে আল্লাহ্র রহমত, বরকত ও ফজল কিছুই থাকে না। অপদার্থ সন্তানেরা অন্যায় ও অপকর্মে সে সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করে। যে ভাবে সঞ্চয় করা হয়েছিল সে ভাবেই তা বিনাশ হয়ে যায়। সন্তানদের কারণেই সে হয় কপর্দকহীন ও নিস্ব। পারিবারিক সুখ-শান্তি থেকে সে হয় বঞ্চিত এবং সমাজে হয় ঘৃণিত ও অবহেলিত। কথায় বলে 'হারামের আরাম নাই'। এভাবে নিজের অপকর্মের কারণে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। অপর দিকে নির্লোভ ও সাধু ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ম নীতি অনুসারী সৎপথে অর্থ উপার্জন করেন বলে তার সন্তানরা হয় মানুষের মতো মানুষ, যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। এরা যেমন পিতা-মাতার শান্তির কারণ হয় তেমনিই হয় দেশ ও জাতির গর্ব ও শ্রদ্ধার পাত্র। এভাবে এতে পিতামাতা ও সৎকর্মের কারণে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কবি তাই যথার্তই বলেছেন ঃ

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।'

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণেই সে কালের বিশিষ্ট ধনবতী ও সাধ্বী নারী বিবি খাদীজা (রা.) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নবী করীম (সা.)কে স্বামীরূপে গ্রহণ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে নবী করীম (সা.)-এর জীবন সবদিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এটা ছিল রসূলে আকরাম (সা.)-এর সত্যতা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার এবং এভাবে তিনি সুখের পরশ পেয়ে স্বর্গ সুখ লাভ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তার নিজের আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে, এবং যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়'। (বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১৬)

জাহান্নামের শাস্তি এবং জান্নাতের পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইহলোকে কৃত কর্মের ভাল ও মন্দ ফলাফলের মূর্ত প্রকাশ ও প্রতিরূপ মাত্র। মানুষ ইহজগতে এবং পরকালে নিজেই নিজের পুরস্কার বা শাস্তি দাতা।

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, শান্তি বাহির হতে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যান্তর হতে তা জন্ম নেয়। জাহান্নামের শাস্তি এবং জান্নাতের পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইহলোকে কৃত কর্মের ভাল ও মন্দ ফলাফলের মূর্তি প্রকাশ ও প্রতিরূপ মাত্র। মানুষ ইহজগতে এবং পরকালে নিজেই নিজের পুরস্কার বা শাস্তি দাতা। এক কথায় মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্তা। মানুষ ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলে পুরস্কার লাভ করতে পারে ।

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) উল্লেখিত আয়াতের হেদায়াত অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার লাভ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের বহু পূর্ব থেকেই তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইসলাম কবুলের পর তিনি সার্বক্ষণিক ভাবে অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় নবী করীম (সা.)-এর পাশে পাশে থেকেছেন। সে কারণে তিনি ইচ্ছা করেই ব্যবসা করা বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ব্যবসা করতেন তখন ন্যায় নিষ্ঠার সাথে তা করেছেন। একজন সৎ ও সফল ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। অনেকে তাঁর মাধ্যমে লাভবান হওয়ার জন্য তাঁকে টাকা দিত। হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে নিরাশ করতেন না। তিনি তাদের টাকা নিতেন এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সে অনুযায়ী তাদের লাভ্যাংশ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতেন। বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক বা মুনাফা গ্রহণ করতেন না। অনেক মহিলাও এভাবে লাভবান হয়েছিলেন। তাঁর সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার কারণে তিনি পুরস্কার স্বরূপ ইসলামের আলোকে আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবুবকর (রা.) ব্যক্তিগত সকল কর্মকান্ড বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশের অনুগামী হয়ে তা অনুসরণ করেছেন। রসূল করীম (সা.) নবুওয়ত দাবী করার পর তাঁর মতো একজন একনিষ্ঠ সহচর সে সময় খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই যোগ্য অনুসারী হিসেবে তিনি নবী করীম (সা.) এর সঙ্গে সর্বাবস্থায় ছায়ার মত বিরাজ করেছেন।

সে কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। পুরুষদের মধ্যে তিনি হয়েছেন প্রথম ইসলাম কবুলকারীর সম্মানে সম্মানিত, নবী করীম (সা.)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধুর এবং মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হওয়ার সম্মানে সম্মানিত। তাঁর জীবদ্দশায় এ পৃথিবীতেই তিনি জান্নাতের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন, পরকালেও ভোগ করবেন অনন্ত স্বর্গসুখ। সুবহানাল্লাহ্।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) সংঘাতময় ও সমস্যা সংকুল পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের শান্তিশুধা পান করে এ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে শান্তিকামী মানুষেরা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাআতভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে আহমদীদের সংখ্যা ২০ কোটির উপরে। তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার অনুশাসন এবং রসূলে পাক (সা.) এর আদর্শ মত চলে আধ্যাত্মিক ও দুনিয়াবী শান্তি লাভ করে পরম সুখে আছেন। এ ব্যাপারে এখনো যারা পিছিয়ে আছেন তাদেরকে একই ভাবে শান্তি ও সুখ লাভের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর মিছে সংঘাত নয়, সন্ত্রাস নয় নিষ্কুশ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আজ এক সারীতে দাঁড়িয়ে একই পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। মনের সব সন্দেহ ও সশংয় দূর করে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা এবং রসূলে পাক (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যিনি মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন তা সঠিক ভাবে যাচাই করুন। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদে কান না দিয়ে নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন, আপনারা ইসলামের দুর্দিনে সঠিক কাজটি করছেন কিনা। উত্তর ঠিক পেয়ে যাবেন। না করে থাকলে যারা সঠিক ভাবে কাজ করছেন তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে, তাদেরকে সহযোগিতা করুন। তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইসলামের সেবা করুন। ইসলাম ধর্মে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশনা রয়েছে সেভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুন। এতে নিজেরা সুখে থাকবেন আর অন্যরাও সুখে থাকবে। এর ফলে আল্লাহ্ তাআলার রহমত, বরকত, কল্যাণ ও আশীষ দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ভরপুর হয়ে যাবে। তাই নিজেরা উপকৃত হোন, নিজ বংশধরদেরও উপকৃত করুন। নয়তো ভবিষ্যতে আপনাদের সন্তানরাই আপনাদের ভুলের কারণে সৃষ্ট সংঘাত, সহিংসতা, সন্ত্রাস ও অশান্তির জন্য আপনাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে এবং এজন্য আপনাদেরকেই দায়ী করবে। তখন সময়ের কাজ সময় মতো না করার জন্য অনুতাপ করা ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না। তাই সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করুন এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করুন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মাকসুদা রহমান

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার আগামী ৩১ মে ২০০৮ সংখ্যাটি খেলাফত জুবিলী সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে, সেই সংখ্যাটিতে বিশেষভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনী ও তাঁর আশিসময় খেলাফতকালের উল্লেখযোগ্য বিবরণ দ্বারা সমৃদ্ধশালী হবে, ইনশাআল্লাহ্। এতদুদ্দেশ্যে জামাআতের সুহৃদ লেখকবৃন্দের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা আগামী ৩০ এপ্রিল ২০০৮ এর মধ্যে পাক্ষিক আহমদীর দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।

–সম্পাদক

সংশোধনী

গত ১৫ মার্চ, ২০০৮ তারিখের পাক্ষিক আহমদীর সংখ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ নামক প্রবন্ধের পৃঃ ৩৩ কলাম তৃতীয় ছয় নম্বর লাইনে 'ইয়াবাজাত তাজ' শব্দের পরিবর্তে ***এখরাজে নেযামে জামাআত*** পড়তে হবে এবং পৃঃ ৩৪ কলাম ২য় ছয় নং লাইনে 'আহমদীয়া' শব্দের পরিবর্তে ***অধিবাসী*** শব্দ পড়তে হবে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য প্রবন্ধকার দুঃখিত।

মহান স্বাধীনতা দিবস

২৫শে মার্চের কাল রাতে হানাদার বাহিনী বর্বরোচিত হামলা চালায় নিরিহ দেশবাসীর উপর। এতে বীর বাঙ্গালী অবতীর্ণ হয় স্বসস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। ২৬শে মার্চ ঘোষিত হয় মহান স্বাধীনতা।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

সারা দেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয় 'মুসলেহ্ মাওউদ দিবস' নিম্নে সংবাদ পরিবেশন করা হলো।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘাটুরায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

আল্লাহ্ তাআলার অসীম কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘাটুরার উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের আলোচনা সভা শুরু হয় বাদ আসর। জনাব এস, এম, হাবীবুল্লাহ্ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহতি সভায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর মহান আদর্শ, শিক্ষা ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আসাদ উল্লাহ্ আসাদ মোয়াল্লেম, এস এম মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম এবং জনাব এস এম ইব্রাহীম, জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঘাটুরা। দোয়ার মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। সবশেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। প্রায় ১১০ জন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মুছা মিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, খুলনা-য় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, খুলনার উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ বাত জুমুআ স্থানীয় জামাআতের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব-এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ এবং নযম পাঠ করে শুনান শেখ মোহাম্মদ ওমর (প্রিন্স)। অতঃপর মহান মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী সেক্রেটারী তবলীগ, জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান আঞ্চলিক সমন্বয়ক ও জয়ীম আলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্ খুলনা ও মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। সবশেষে সভাপতি স্থানীয় জামাআতের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দিক নির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সিলেটে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সিলেট গত ২২/০২/০৮ইং বাদ জুমুআ মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস আধ্যাত্মিক ভাব গম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতারাম ইকবাল চৌধুরী প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সিলেট। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তসলিম ভুঁইয়া এবং নযম পাঠ করেন জনাব আরিফ আহমদ। তারপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শাহীন আহমদ, রুবেল সরকার, তসলিম ভূইয়া, সোহেল আহমদ ও মোহতারাম প্রেসিডেন্ট সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সোহেল আহমদ

তেবাড়িয়া জামাআতে উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২২/০২/০৮ তারিখ বাদ জুমুআ তেবাড়িয়া জামাআতের উদ্যোগে অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবস পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট সাহেব। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মাওলানা খোরশেদ আলম মুবাশ্বের মুরব্বী, মোহাম্মদ হামজা আমীর আলী, মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দীক। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট ৯৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দীক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২২ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিহা সাবাহ, হাদীস ও মলফুজাত থেকে যথাক্রমে তাসলিমা আজীজ ও রোকেয়া বেগম এবং মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতারমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা, ঐতিহাসিক ইলাহামী ভাবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাকসুদা রহমান সাহেবা, এ ছাড়াও বক্তৃতার মাঝে মাঝে নযম শোনান সাহিনা সোহেলি, ফাইজা হোসেন ও ছোট ছোট নাসেরাতবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮৭ জন লাজনা নাসেরাত। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতারমা আমাতুল কাইয়ুম সাহেবা নায়েব সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং সভানেত্রী মোহতারমা রহিমা জাকির প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা।

তাসলিমা আজীজ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে ০৭/০৩/০৮ইং তারিখ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের লাজনা জুয়েল আক্তার সাহেবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস পাঠ ও নযমের পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী, মুলেহ্ মাওউদ (রা.) বাল্যকাল, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন ও মুসলেহ মাওউদ এর গুণাবলী আলোচনা করা হয় এই অনুষ্ঠানে ৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রোকসনা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ , রাজশাহীর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে গত ২০/০২/০৮ তারিখ বুধবার মোহতরমা খালিদা খানমের বাসগৃহে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতারমা সাজলীনা রহমান (প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী)। দোয়া আহাদনামা ও নযম পাঠের পর ৪ জন বক্তা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাজের আজাদ (সেক্রেটারী তবলীগ), রাশিদা কানেতা, সুলতানা সামিয়া বেগম, সাজলীনা রহমান (প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী), অনুষ্ঠানে নযম পাঠ করেন কোহিনূর বেগম, রেবেকা সুলতানা, অনুষ্ঠানে ১৫ জন লাজনা ২ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বস্‌রা সুলতানা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ , নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

নারায়ণগঞ্জের লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে গত ২৯/০২/০৮ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ)। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতারমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত তরজমাসহ পাঠ করেন মোহতারমা আয়েশা সিদ্দিকা। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন মোহতারমা রেজোয়ানা আহমদ (শম্পা), খাওলাদীন উপমা। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন, মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকপাত, ২০শে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার এক বড় প্রমাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহতারমা সুফিয়া বেগম, মোহতারমা কাওসার জাহান, সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শেষ হয়, উক্ত অনূষ্ঠানে ৩১ জন লাজনা ও ২৭ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন, পরিশেষে আপ্যায়নের মাধ্যমে এই মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উম্মে কুলসুম (চায়না)

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ–(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি

রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি

অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

ঢাকা'র মাদারটেক হালকার মসজিদ 'মসজিদুল হুদা' শুভ উদ্বোধন

ঢাকা'র মাদারটেক হালকার মসজদি উদ্বোধনকালে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, ন্যাশনাল আমীর ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সদস্যদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা মহানগরের খিলগাঁও থানার অন্তর্গত নন্দীপাড়া এলাকায় সমাজ সেবক সুন্দরবনের সরদার মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার সাহেবের প্রচেষ্টায় দুই/তিন যুগ ধরে অনেক আহমদী পরিবার বসবাস করে আসছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে আহমদীদের অধ্যুষিত এক নতুন স্থান। এখানেই সম্প্রতি নির্মিত হয় আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ঐশী ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এ মসজিদের তিনি নামকরণ করেছেন 'মসজিদুল হুদা'। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ্ মোহতারাম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহ্‌লুন সাহেব। উদ্বোধনীর দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি ছিল মাদারটেক হালকার আহমদীদের আনন্দঘন ও উৎসব মুখর দিবস। বিকাল ৩ টায় কানায় কানায় ভরে যায় মসজিদ। অত্র হালকার বাহির থেকেও অনেক আশেকে মসীহ্ নাড়ীর টানে ছুটে আসেন। বর্ষিয়ান মুরব্বী জনাব কওসার আলী মোল্লা আগত প্রধান অতিথি হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। তখন সবার হৃদয়ের একতারাতে একত্ববাদের সুরে যেন বেঁজে উঠেছিল–

আমার সরোদে যত সুর আছে
বুকে আছে যত প্রেম,
খেলাফতের ডাকে উজাড় করে
হে মহান অতিথিগো তোমায় দিলেম।

ঢাকা আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের আমীর মোহতারাম আফজাল আহমদ খাদেম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এ উদ্বোধনী সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব ইনসান আলী। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ও হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি দোয়া পরিচালনা করেন এরপর বক্তব্য রাখেন, মোহতারাম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশ, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর, জনাব আব্দুল আজিজ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ফাইনান্স, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা এবং সভার সভাপতি জনাব আফজাল আহমদ খাদেম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব কওসার আলী মোল্লা ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত।

অনেকের বক্তব্য থেকে এ মসজিদ নির্মাণের পটভূমি, অনেক চড়াই উৎড়াইয়ের মাঝে এর সফলতা, বিভিন্ন জনের নিরলস প্রচেষ্টা ও অবদান, জামাআতের তালিম তরবীয়ত ও ইবাদতে এর ভূমিকা এবং আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্ব ইত্যাদির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক এর নামকরণ এবং তাঁর প্রেরিত সম্মানিত প্রতিনিধি কর্তৃক উদ্বোধনে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের প্রতি শুকরিয়া জানাই। অনাগত ভবিষ্যতে আহমদীয়াতের বিজয় গাঁথা কাহিনীতে এ 'মসজিদুল হুদা' মাইল ফলক সৃষ্টি হোক, ঐশী নূরের পরশ এর চারদিকে বিকশিত হোক, আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্করিত হোক এবং তারীখে আহমদীয়াতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকুক সেই দোয়াই আজ আন্তরিক ভাবে করি।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

New Vol. No. 70 | 18th Issue | 31 March, 2008 | Tk. 10.00
Fortnightly | The AHMADI | রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ **প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন।** এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ **প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায** (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) **আদায় করুন।**

৩ **সূরা ফাতিহা** কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব** [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে।** প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ।** (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ **দুরূদ শরীফ।** (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: amgb@bol-online.com